বনদেবী

("চিত্ত-চমৎকারী সমাজ-চিত্র।")

দার্শনিক-পণ্ডিত

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

ষোড়শ সংস্করণ।

(চতুর্থ পর্য্যায়)

প্রাপ্তিস্থান—

কমলিনী অফিস,

১১৪, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীস্তুটবিহারী মজুমদার।
১০৯/৩ নং অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ় —১৩২৬।
দ্বিতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন —১৩২৬।
তৃতীয় সংস্করণ—আষাঢ় —১৩২৭।
চতুর্থ সংস্করণ—আশ্বিন —১৩২৮।

সস্তার কিস্তি মাৎ!

বাঁশের দরে—নীলামের দামে—টাকায় তিনখানা,

৩৲ তিন টাকার মাল ১৲ এক টাকায়!

সহর-প্রসিদ্ধ 'শিশির-পাবলিশিং-হাউস' হইতে প্রকাশিত

নাট্য-সাহিত্যের দানাদার জড়োয়ালঙ্কার—

১৲ এক টাকা সংস্করণ সিরিজ

আমরা ১৲ এক টাকায় তিনখানা দিব।

কি—কি?

১। গিরিশচন্দ্র ১৲ ২। তারাসুন্দরী ১৲ ৩। অর্দ্ধেন্দুশেখর ১৲

৩ মূল্যের ঐ তিন খানি আমাদের নিকট ১৲ এক টাকা, ডাকে ১।০

অথবা

১। দ্বিজেন্দ্রলাল ১৲ ২। তিনকড়ি ১৲ ৩। অমরেন্দ্রনাথ ১৲

৩৲ মূল্যের এই তিনখানি ১ এক টাকা, ডাকে ১।০।

প্রাপ্তিস্থান—আপনাদের সেই

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কৌমুদী প্রেস,
প্রিন্টার—শ্রীচণ্ডীচরণ গুপ্ত।
১৫এ ভুবনমোহন সরকার লেন, কলিকাতা।

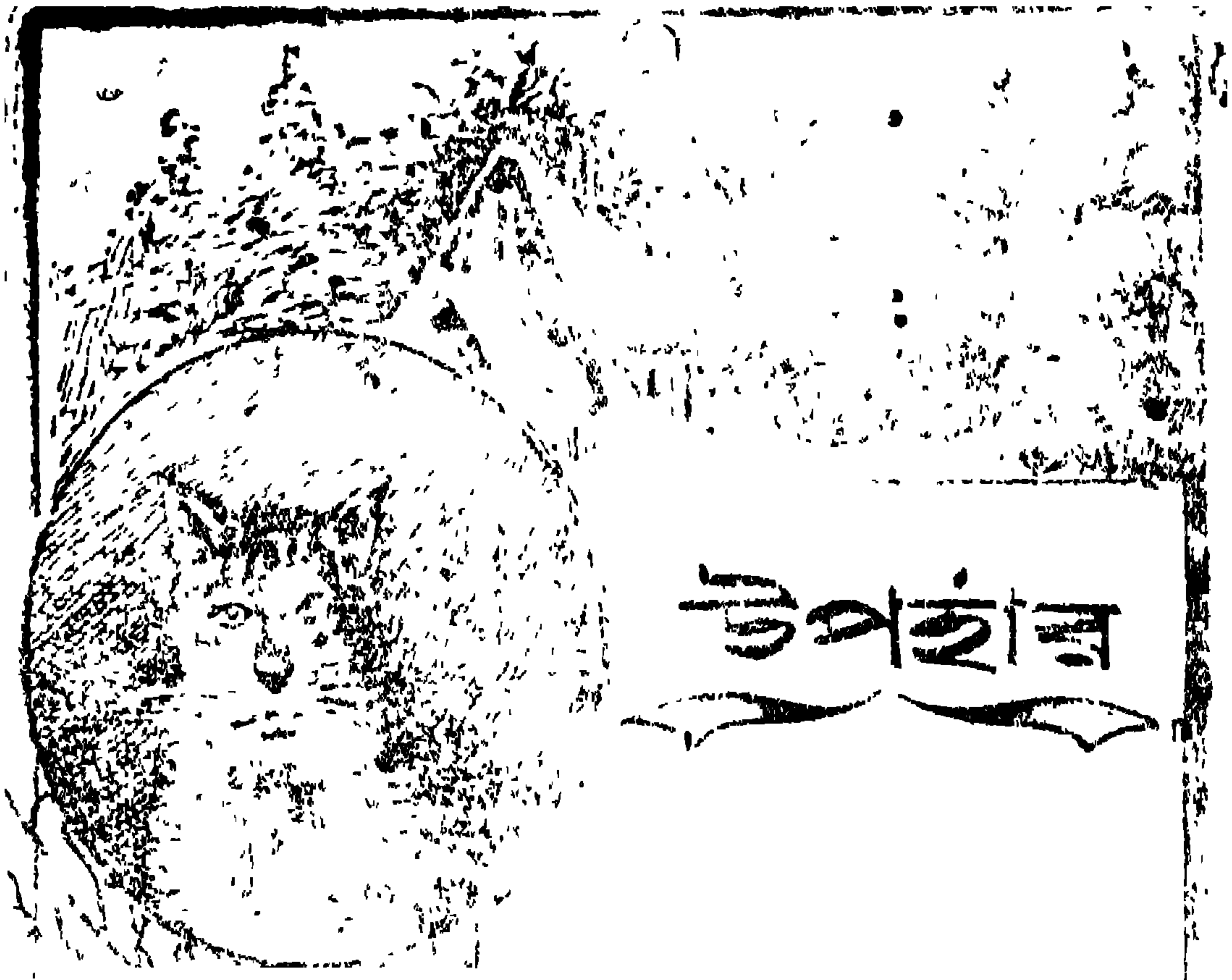

উপহার

B8804

'অনাথ-পাব্‌লিশিং-হাউস' হইতে প্রকাশিত—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

১।০ পাঁচ সিকা মূল্যের নূতন উপন্যাস

আমাদের নিকট সডাক ১৵০ এক টাকা এক আনায় পাইবেন।

মধুর বৃন্দাবন—মধুর কুঞ্জবন—মাধুরীমাময় মদনমোহন! মধুর বাঁশরী—মোহন-ঠাম—বিবস-অঙ্গ - বিভল-মগন। নামের ছড়াছড়ি—কাড়াকাড়ি—পুণ্য-রজে গড়াগড়ি। উপন্যাসের মধ্যে মন-মজানো প্রাণ-গলানো ভগবৎ প্রেমের অমল-ধবল-রজত-ধারা. এমনটি আর কিছুতে নাই! চাহিয়া দেখুন।

প্রাপ্তিস্থান,—

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

১-৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রহ্মদেবী।

(১)

"আর সহ্য হয় না" বলিয়া, একটি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর যুবক শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। যুবকের বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর,—নাম ভুবনমোহন। ভুবনমোহন কর্ম্মঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়ী এবং সংস্কৃত, পার্সী ও বাঙ্গালাভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। কিন্তু হায়! দরিদ্রতা যাহাকে গ্রাস করিয়াছে, অহরহ দারিদ্রতানলে দহ্যমান সে গুণী হউক, জ্ঞানী হউক, এ সংসারে তাহার সুখ-শান্তি কোথায়? যেমন অতি সুন্দরী যুবতী অন্ধ হইলে তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ অপার গুণাবলী সম্পন্ন মানুষের গুণরাশি দারিদ্র্য-মেঘে ঢাকিয়া থাকে। ইহা জগতের নিয়ম,—মানব সমাজের অবশ্যম্ভাবী বিধি। দরিদ্র ভুবনমোহনের গুণরাশিও যে উপযুক্ত কার্য্যে ন্যস্ত থাকিবে, তাহার আশা করা যায় না। ভুবনমোহন যদুনাথ রায় জমিদারের বাড়ী সামান্য বেতনের মুহরীর কার্য্যে নিযুক্ত।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সোদপুর নামে এক গ্রাম আছে। এখন এই গ্রামের অবস্থা অতিশয় হীন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যখন বঙ্গের সিংহাসনে নবাব সিরাজউদ্দৌলা অধিষ্ঠিত—যখন বঙ্গের রাজনৈতিক গগন ঘোর তমসাচ্ছাদিত, অথচ বঙ্গীয় প্রজা-

গণ ধন-ধান্য সমাযুক্ত, যখন আমাদিগের এই আখ্যায়িকার সময়, তখন সোদপুর অতীব সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। নানা জাতীয় লোক শ্রেণীবদ্ধক্রমে গ্রামে বসতি করিত। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আচার্য্য, তন্তুবায়, গোপ, গন্ধবণিক, মালাকার, তাম্বুলী, তরকারী বিক্রেতা, মুসলমান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেরই বহুল পল্লিমাঝে বসতি ছিল। হাট, ঘাট, বাজার, রাজপথ ও অট্টালিকা সমূহেরও বিলক্ষণ পারিপাট্য পরিলক্ষিত হইত। সুতরাং এই গ্রাম যে তৎকালে পূর্ব্ববাঙ্গালার মধ্যে একটি সুপ্রসিদ্ধ স্থান ছিল, তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সোদপুরে যদুনাথ রায় নামক একজন অতিশয় ধনবান্ ও গণ্যমান্য জমিদারের বাড়ী ছিল। এখন সে বংশের কেহ নাই— বাড়ীটিও নাই। তাহার ধ্বংসাবশেষ আজিও কিছু কিছু পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেই সকল চিহ্নাদি দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, যদুনাথ রায়ের বাড়া অতিশয় বৃহৎ ছিল।

এই বৃহৎ অট্টালিকার বহির্বাটীর একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ভুবন মোহন শয্যায় শয়ন করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। শেষে সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া "আর সহ্য হয় না!" বলিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, দীপালোকের নিকট গমন করিয়া একখানি পত্র পাঠ করিলেন! পত্রখানি তাঁহার বাটী হইতে আসিয়াছে। ভুবনমোহনের বৃদ্ধা মাতার অত্যন্ত ব্যায়রাম;— তাহার চিকিৎসাদির ব্যয় লইয়া তাঁহাকে বাড়ী যাইতে লেখা হইয়াছে। বাটীতে তাঁহার আর কেহ নাই।

ভুবন পুনরায় অন্তঃস্থলস্পর্শী একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"এখন কি করি। মাসের এই প্রথমাংশ মাত্র, এখন কিছু বেতন চাহিলেও পাওয়া যাইবে না। আমার নিকট সবে দু'টি টাকা আছে, ইহাতেই বা কি হইবে! ভগবান্, কি করি!" বলিতে বলিতে ভুবনের কপোলদেশ দিয়া দুই এক বিন্দু স্বেদনীর বহির্গত হইয়া পড়িল। তখন তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সুগভীর চিন্তামগ্ন চিত্তে ভুবনমোহন পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে তাহার কর্ণ-বিবরে সুকরুণ প্রাণভেদী ক্রন্দনধ্বনি প্রবিষ্ট হইল। তিনি সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া একটী কুটীর দ্বারে উপনীত হইলেন। অর্গল অনাবদ্ধ দেখিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন—দেখিলেন, এক দরিদ্র যুবক একটি রোগিণীর শিয়রদেশে বসিয়া বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। রোগিণীর কথা কহিবার শক্তি নাই। ক্ষীণ-প্রদীপালোকে ভুবন দেখিলেন, সে লতিকার চক্ষুদ্বয় হইতে নীরবে অশ্রু-সম্পাত ঝরিয়া গণ্ডস্থলে পড়িতেছে, আবার তথা হইতে স্খলিত হইয়া বিছানায় পড়িতেছে। আর এক-একবার দুর্বল হস্তখানি দ্বারা যুবকের হস্ত ধরিয়া নিজ মস্তকে দিতেছে। ভুবন সে দৃশ্য দেখিয়া বড়ই কাতর হইলেন, বলিলেন, "মেয়েটির কি হইয়াছে?"

যুবক বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া বিজয়া-সময়ের প্রতিমা-মুখের ন্যায়, অস্তগমনোন্মুখ শরত-চাঁদিমার ন্যায়, হৃদয়-চাঁদিমার দারুণ রোগে নিষ্পীড়িত মুখখানি দেখিতেছিল—আর ভাবিতেছিল, বুঝি এ মুখ দেখা শেষ হইল—এ জনমে আর বুঝি দেখিতে পাইব না। তাই বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল। ভুবনের কথায় তাহার জ্ঞানের উন্মেষ হইল। কাঁদিতে-কাঁদিতে

বলিল, "আপনি কি চিকিৎসক? আপনি কি দরিদ্রের প্রতি দয়া করিয়া বিনা টাকায় আমার জীবনধনের জীবন দান দিয়া আমার জীবন কিনিতে আসিয়াছেন?"

ভুবন বুঝিলেন, ব্যাধিক্লিষ্টা যুবতী এই যুবকের স্ত্রী। বলিলেন, "না, আমি চিকিৎসক নহি। তোমার স্ত্রীর কি হইয়াছে?"

যুবক নিরাশ হৃদয়ে উদ্‌ভ্রান্তস্বরে বলিল, "জ্বর হইয়াছে।"

ভুবন। ক'দিন?

যুবক। আজ দশদিন।

ভুবন একটু নাড়ীজ্ঞ ছিলেন, রোগিণীর হস্ত ধরিয়া দেখিলেন। বলিলেন, "ভয় নেই, এমন কোন দোষ সংঘটিত হয় নাই, যাহাতে নিশ্চয় মৃত্যু হইবার সম্ভব—তবে চিকিৎসা করান চাই।"

যুবক কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, "ওগো, আমার কি আছে যে, আমি তাহাই চিকিৎসককে দিয়া চিকিৎসা করাইব? থালা, ঘটি যাহা ছিল, তাহা বেচিয়া যে কয়টি টাকা হইয়াছিল, তাহা কবিরাজকে দিয়াছিলাম। এ কয়দিন দেখিয়াছেন, আজ সন্ধ্যার সময় জবাব দিয়া গেলেন, টাকা না পাইলে আঁর চিকিৎসা করিতে পারিবেন না। ওগো, আমি টাকা কোথায় পাইব! কেমনে আমার হৃদয়ের যে সর্ব্বস্ব, সংসারের যে অবলম্বন, সে জীবন পাইবে?"

ভুবন একাগ্রচিত্তে তাহার কথা শুনিতেছিলেন, শুনিতে শুনিতে তাঁহার বড় বড় দু'টি চক্ষু হইতে জলরাশি গড়াইয়া পড়িল। কোঁচার কাপড়ে সে জল মুছিয়া বলিলেন, "যে কবিরাজ চিকিৎসা

করিতেছিলেন, তাহার বাড়ী কোন্ পাড়ায়?" যুবক সমস্ত বলিল।

ভুবন। টাকা পাইলে তাঁহাকে আনিতে পারি?

যুবক। কেমন করিয়া যাইব, আমার আর ত কেহ নাই গো, যে এখানে বসিবে!

"তবে আমিই গেলাম" বলিয়া ভুবনমোহন চলিয়া গেলেন এবং অনতিবিলম্বেই কবিরাজকে সমভিব্যাহারে লইয়া দরিদ্রের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিজের যে দু'টি টাকা পুঁজি ছিল, তাহা কবিরাজকে দিয়া ঔষধাদির বন্দোবস্ত করিয়া সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ভুবনমোহন সেই স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। মনে মনে কত কি ভাবিলেন। শেষে হৃদয়ভেদী যন্ত্রণাময় স্বরে বলিলেন, "এ কি সংসার! এই সুবিশাল সংসারের কোথাও কি প্রেম নাই, কোথাও কি শান্তি নাই! কোথাও দুঃখে দুঃখ নাই, কষ্টে মমতা নাই—কেবলি যন্ত্রণার দারুণ উপহাস, ন্যায়ের প্রতি অন্যায়ের অবিচার, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার! এ কি গূঢ় রহস্য! যন্ত্রণা ও বেদনার অট্টহাসি লইয়া পৃথিবী অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া চলিয়াছে!"

(২)

"ঠিক বলেছ ভুবন, এ পৃথিবী যন্ত্রণা ও বেদনার অট্টহাসি লইয়া অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া চলিয়াছে।"

মৃদুস্বরে এই কথা বলিয়া ভুবনের শয্যাপার্শ্বে এক অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী দাঁড়াইল। যুবতী পূর্ণগৌরাঙ্গী—গৌরাঙ্গে সৌন্দর্য্য যেন ধরে না—গৌরাঙ্গীর সৌন্দর্য্যছটা যেন নীরব-কবিতার মত বা চাঁদের হাসির মত হাসিয়া বেড়াইতেছে। যেন যুবতীর পূর্ণ প্রস্ফুটিত দেহে পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য সংযুক্ত রহিয়াছে। সে রূপ, সে আকর্ণবিশ্রান্ত নীল নয়নেন্দিবর-যুগল, সে আকুঞ্চিত ভ্রূ-দ্বয়, সে উন্নত নাসিকা, সে পাতলা গোলাপী অধরোষ্ঠ দু'খানি, সে মৃণালনিভ ভুজযুগল, সে উন্নত বক্ষঃস্থল, সে ক্ষীণ কটি, সে নিবিড়-নিতম্ব, সে সৌন্দর্য্যরাশি, সে লাবণ্যপ্রভা দেখিলে মনে কেমন এক-রূপ ভাবের উদয় হয়—মন যেন উধাও হইয়া কোন্ স্বপ্নরাজ্যের কোন্ স্বর্গীয় নন্দন কাননে প্রবিষ্ট হয়। যুবতীর গাত্রে অধিক অলঙ্কার নাই, তবে নিতান্ত অল্পও নহে, মাঝের নাকে একটী নোলক। অগুল্‌ফবিলম্বিত চুলরাশির বেণী—কুন্তলীকৃত, মস্তকোপরি পরিশোভমানা। যুবতীর নাম **বনদেবী**। বনদেবী জমিদার যদুনাথের দুহিতা।

ভুবনমোহন চাহিয়া দেখিলেন। প্রাণের ভিতর বসন্তের বাতাসটুকুর মত কি বহিয়া গেল। উঠিয়া বসিলেন—বলিলেন, "বনদেবী! তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?"

বনদেবী মস্তক নাড়িয়া বলিল, "আসিতে কি নাই?"

ভুবন। না। তুমি জমিদারের কন্যা, আমি ভিখারী, তোমাদিগের চাকর। কেন তুমি আমার নিকটে আইস? কেহ দেখিলে কি মনে ভাবিবে এবং আমার গতিই বা কি হইবে!"

বনদেবী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে—নিঃশব্দে ভুবনের মুখের দিকে

চাহিয়া থাকিল। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "তবে আর আসিব না, ভুবন! এখনি যাইব কি?"

ভুবন সে কথায় আত্মসংযম করিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল, বলিলেন, "বনদেবী! কি আবশ্যকে এত রাত্রে আমার কাছে আসিয়াছিলে?"

বনদেবী কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভুবন, আমি যে কি হতভাগিনী, পূর্ব্বজন্মে আমি যে কত পাপ করিয়াছিলাম, তাঁহা বলিতে পারি না। ভুবন, আমি তোমাকে দেখিয়া সব ভুলিয়াছি—তোমাকে না দেখিলে আমার প্রাণের ভিতর কেমন করে। মনকে কত প্রবোধ দিতে যাই, কিন্তু মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। ইচ্ছা করে, তোমার পার্শ্বে বসিয়া তোমাকে "আমার" বলিয়া সোহাগ করি; বিধাতা বুঝি সে সাধে বাদ সাধিলেন। যাহা হউক, নিশ্চয় জেন ভুবন, তুমি আমারই। ইহকালে না পারি, পরকালে তোমাকে আমি আমার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব। আর ইহকালে—ইহকালে অন্য পুরুষকে বামপদের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারাও স্পর্শ করিব না—আমি তোমারই।"

ভুবন সে কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। বলিলেন, "বনদেবি! তোমাকে ত আমি লজ্জাহীনার ন্যায় এত কথা একেবারে বলিতে কখনও শুনি নাই। প্রশ্ন করিলে মুখের দিকে চাহিয়া থাক, ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ কর। আজ এ কি ভাব? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা।"

বনদেবী অশ্রুহীননেত্রে হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসে বলিল, "ভুবন! আমি লজ্জাহীনা হইয়াছি—হৃদয়ের গভীর যাতনায় লজ্জাহীনা হইয়াছি। তোমার নিকট আমার লজ্জা কি! আমার হৃদয়ের

যাতনা তোমাকে জানাইব না ত আর কাহাকে জানাইব ? আমি আর অধিক দিন এ জগতে থাকিতে পারিব না ! বোধ হয় আর এক সপ্তাহ মধ্যে এ পাপ স্বার্থপূর্ণ জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইব। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত পিতা আমার বিবাহ দিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন। আজি হইতে সপ্তাহ পূর্ণ দিবসে বিবাহ হইবে এরূপ স্থির হইয়াছে। সাতুরের কাজী সাহেব তাহার ঘটক ! সুতরাং এ পাপ বিবাহের পূর্ব্বে আমি মরিব !”

সোদপুর হইতে অনুমান তিন চারি ক্রোশ অন্তরে সাতুর নামে আর একখানি গ্রাম আছে। যদিও এখন সাতুর পূর্ব্ব গৌরব হইতে স্খলিত হইয়াছে, তথাপি এখনও সেখানে বহুতর ধনী, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চবংশীয় মুসলমানের বসতি আছে এবং সাতুরের শীতলপাটি অদ্যাপিও তথাকার শিল্পকার্য্যের উন্নতির পরিচয় প্রদান করিয়া অন্যস্থানের উত্তম শীতলপাটি অপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্ত হইতেছে।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময়ে এই গ্রামে একজন কাজী বা রাজকীয় কর্ম্মচারী বাস করিতেন। পূর্ব্ব নবাবদিগের সময়ের যে কাজী ছিলেন, সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করতঃ এই নূতন কাজীকে তৎপদস্থ করিয়াছিলেন। শুধু সাতুরের কাজী বলিয়া নহে, সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনারূঢ় হইয়া মাতামহের সমস্ত পুরাণ কর্ম্মকারক ও সেনাপতিদিগকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। কু-প্রবৃত্তির উত্তেজক অদূরদর্শী অল্পবয়স্ক ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণই তাঁহার বিশ্বাসভাজন ও কর্ম্মচারী হইয়াছিল! তাহারা তাঁহার কেবল অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে পরামর্শ দিত। সেই সকল পরামর্শের এই ফল

দর্শিয়াছিল যে, তৎকালের প্রায় কোন ব্যক্তির সম্পত্তি বা কোন সুন্দরী স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা পায় নাই। সাতুরের কাজীও সেই শ্রেণীর নবীন কর্ম্মচারী, সুতরাং তিনি যে যদুনাথ রায়ের সুন্দরী কন্যাটী নবাবকে দিতে প্রভৃত যত্ন করিবেন না—একথা প্রামাণ্য বা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যার রূপ বর্ণনার ন্যায় রূপ বর্ণনা করিয়া তিনি বনদেবীর কথা নবাবকে লিখিয়া পাঠান। বিলাসী-নবাব তদুত্তরে লেখেন—যেরূপেই পার, সে সুন্দরীকে আমার বেগম করিয়া দিতে হইবে। কাজীসাহেব সেকথা যদুনাথকে বলায়, তিনি আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ ভাবিয়া নবাবকে কন্যাদান করিতে সম্মত হইয়াছেন।

ভুবনমোহন স্থিরনেত্রে অকুঞ্চিত চিত্তে বনদেবীর কথার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "সে কি বনদেবী! তুমি কেন আত্মহত্যা করিয়া মরিবে? আত্মহত্যায় যে মহাপাপ হয়। আরও বিশেষতঃ তুমি নবাব-পত্নী হইবে। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার মহারাণী হইবে, কেন তাহাতে তোমার এ পাপ অনভিমতি!"

বনদেবী চোখ মুখ লাল করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "ভুবন, আমি কখনও ভাবি নাই যে, তুমি এরূপ কথা বলিবে। হাঁ ভুবন! আমি মুসলমানের সহধর্ম্মিণী হইব? পরম পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিব? হিন্দুর অখাদ্য খাইব? তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে ভালবাসিব? আর্য্যকুল-ললনা হইয়া অনার্য্যের চরণে জীবন বিক্রয় করিব? সতীত্বের মহীয়সী মহত্ত্ব ভুলিয়া যাইব? কেন ভুবন! আমার শরীরে কি হিন্দুশোণিত নাই? আমি কি মরিতে জানিনা?"

অবসন্ন ম্রিয়মাণা বালিকা অটল পদক্ষেপে আরও অগ্রসর হইয়া অশ্রুহীননেত্রে গম্ভীরস্বরে কথাগুলি বলিয়া নিস্তব্ধ হইল।

ভুবনমোহন অশ্রুবিগলিতনেত্রে, জলভরা ফুলের মত বনদেবীর মুখখানির প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "বনদেবী! তবে কি সংসার-ললামভূতা সুকুমার কুসুমের কীট হইয়া এ হতভাগ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিল? আমি ভিখারী, কখনই তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিব না! তবে কি তুমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবে? আর কি তোমাকে দেখিতে পাইব না? এই দেখাই কি শেষ দেখা! এই কি কাল-রাত্রির শেষ কুলগ্ন? এই কি বিজয়া-দশমীর গোধূলি সময়? আমি আগামী কল্য বাটী যাইব—মা'র বড় ব্যায়রাম হইয়াছে। তাঁহার চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্য হয়, এমন এক কপর্দ্দকও বাটীতে সংস্থান নাই! বনদেবি! নিশ্চয় জানিও, তোমা বিহনে ভুবন কখনও জীবিত থাকিবে না—আমিও মরিব।"

বনদেবী সুবিশাল নয়ন বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "কাল সকালেই বাড়ী যাবে? দেখ ভুবন, চারি পাঁচদিন মধ্যে তুমি একবার কি আসিতে পারিবে না? মরণকালে আমি আর একবার তোমায় দেখিব! আর একটি কথা—তোমার মাতাকে চিকিৎসা করাইতে বাড়ী যাবে, তোমার নিকট টাকা আছে ত?"

ভুবন মৃদুস্বরে বলিলেন, "না, আমার নিকট একটি পয়সাও নাই।"

বনদেবী। তবে কি করিয়া মাকে চিকিৎসা করাইবে?

ভুবন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তাই ত, কি করি!"

বনদেবী বলিল, "আমার একখানি অলঙ্কার তোমাকে দেই; তাহা বিক্রয় করিয়া মা'র চিকিৎসা খরচ চালাইও।"

ভুবনমোহন বলিলেন, "তা কি হয় ?"

বনদেবী বলিল, "কেন হয় না ? এই বিপদের সময় তোমার স্ত্রী যদি গায়ের অলঙ্কার খুলিয়া দিতেন, তুমি কি তাহা নিতে না ?"

ভুবন। নিতাম বটে,—

বনদেবী। বুঝিয়াছি, সে তোমার দত্তা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতে। আচ্ছা, তাহার পিতা যে গহনা দিতেন, তাহা কি নিতে না ?

ভুবন। নিতাম, কিন্তু—

বনদেবী। এইবার বুঝিয়াছি। সে তোমার স্ত্রী নিত বলিয়া নিতে। স্ত্রীধনে তোমার অধিকার আছে! আমার জিনিষ তুমি লইবে কেন! একেবারে না লও, এখন কোথাও বন্ধক দিয়া কিছু টাকা লইয়া মা'র চিকিৎসা ব্যয় নির্ব্বাহ কর, পরে সময় হ'লে আমার গহনা আমায় খালাস করিয়া দিও ?"

এই গুরুতর বিপদের সময় না হইলে ভুবন এ প্রস্তাবে সম্মত হইতেন কি না জানি না। কিন্তু এখন না লইলেও আর উপায় নাই। অগত্যা সম্মত হইয়া বলিলেন, "তবে দাও।"

বনদেবী হর্ষোৎফুল্ল হইল। মনে বড় আহ্লাদ, সে ভুবনের একটুও উপকার করিতে সক্ষম হইল। শেষ কথায় কর্ণপাত না করিয়া শয্যাপরি ভুবনের পার্শ্বে বসিল। মৃণালনিভ বাহুলতা প্রসারণ করিয়া বলিল, "অনন্ত গাছটা খুলিয়া লও।"

ভুবনের চক্ষু জলভারাকীর্ণ হইল। বলিলেন, "বনদেবি! আমি কি নির্দ্দয়, না পাষণ্ড, যে তোমার অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া লইব।

বনদেবী বলিল, "ছিঃ ভুবন! তুমি অমন করিও না, ওতে আমার বড় কষ্ট হয়। তুমি খুলিয়া লও।" ভুবন অনন্ত খুলিয়া লইল।

এই সময় সেই অনর্গলাবদ্ধ গৃহে দেওঁয়ানজী আগমন করিলেন। আগমনের কারণ, এই রাত্রে কাজী বাড়ী হইতে পত্র লইয়া লোক আসিয়াছে—ভুবনের দ্বারা তাহার উত্তর লেখাইতে এবং তন্নিবন্ধন আরও কি কি কার্য্য ছিল। দেওয়ানজীকে দেখিয়া উভয়ে যে কতদূর ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। উভয়ের তালু শুষ্ক হইয়া আসিল, পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। দেওয়ানজী চক্ষু আরক্তিম করিয়া কহিল, "বনদেবী, এ কি?"

বনদেবী নির্ব্বাক—নিস্পন্দ।

দেওয়ান। ভুবন! পিশাচাধম! তুই এ কি কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিস্? তুই কি জানিতে পারিস্ নাই যে, এই কার্য্য তোর মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিয়াছে! উঃ, কি পাষণ্ড! প্রভু-কন্যাহরণ! জমিদার যদুনাথ রায়ের কন্যা—বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার নবাবের ভাবিপ্রিয়তমার সহিত তুই প্রেমালাপ করিতেছিস্? আর বনদেবি! ধিক্ তোমার প্রবৃত্তিকে। কোথায়, সর্ব্বজনপূজিত দেববাঞ্ছিত রাজসিংহাসনে বসিবে, না! জুতার-পয়জার—পাজী ভুবনের বামে বসিয়াছ?

কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই। উভয়ের চক্ষুই মৃত্তিকা সংলগ্ন।

দেওয়ান। ভুবন! তোর কি অন্যায় আচরণ! ভাবিয়া দেখ্ দেখি, তুই কি কার্য্য করিয়াছিস্? তোর'ত কিছুতেই নিস্তার

নাই। এই রজনী প্রভাতে তোর দেহ শৃগাল কুকুরের ভক্ষণীয় হইবে।

ভুবন। আপনি বৃথা—

দেওয়ান। রেখেদে তোর কথা। তোর কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে। ফের যদি কথা ক'বি, তবে জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দিব। পাজী ছুঁচো—

ভুবন কাঁদিতে লাগিল।

বনদেবী দেওয়ানের পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দেওয়ানজী, ভুবনের ত কোন দোষ নাই। কেন ভুবনের পবিত্র জীবনের প্রতি হিংসা করেন? আপনি যে দোষের কথা ভাবিতেছেন, তাহার কিছুই নহে। এক্ষণে বলুন, কিসে ভুবন রক্ষা পায়।"

দেওয়ানজী বনদেবীর হস্ত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "যাও, তুমি বাটীর ভিতর যাও। এবার ভুবনকে প্রাণের দায়ে অব্যাহতি দিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য খুব সাবধান!"

বনদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আপনি শপথ করিয়া বলুন।"

"যাও, আর পাকাম করিতে হইবে না। এখান হইতে এখনি চলিয়া যাও, নচেৎ তোমার পিতাকে ডাকিয়া যাহা করিতে হয়, তাহা করিব।" দেওয়ানজী রোষকষায়িতলোচনে বনদেবীর বদন প্রতি চাহিয়া এই কথা বলিলে, বনদেবী হৃদয়মাঝারে কত আশঙ্কা গণিল। কাঁদিতে কাঁদিতে করুণ-কটাক্ষে একবার ভুবনের বিষণ্ণ মুখখানির প্রতি চাহিয়া ভগ্ন হৃদয়টুকু লইয়া বাটীর মধ্যে গমন করিল। দেওয়ানজীও চলিয়া গেলেন।

যতক্ষণ বনদেবীকে দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ ভুবন এক-দৃষ্টে সে দিকে চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশঃ বনদেবী দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। ভুবনের হৃদয়ে কে যেন গাঢ় মসী ঢালিয়া দিল। তিনি আকুল নয়নে একাকী দগ্ধহৃদয়ে অনুতাপের অশ্রু ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন ভুবনের হৃদয় হইতে দারিদ্র্যের তামসী মূর্ত্তি অপসৃত হইয়াছে। তিনি আকুলিত হৃদয়ে ভাবিতেছেন, সংসারে এমন হৃদয়ঢালা নিঃস্বার্থ ভালবাসা কে কাহাকে দিয়া থাকে? এমন সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী কে কাহার হইয়া থাকে? এ স্বর্গীয় ভালবাসার প্রতিদান ভুবন কি দিবে? বনদেবী ত তাঁহার নিকট আর কিছুই চাহে না—কেবল ভালবাসা। কিন্তু হতভাগ্য ভুবন এমনই সুখ-শান্তিহীন জীবন লইয়া জন্মিয়াছে যে, এতটুকু ভালবাসা দিয়াও একজনকে সুখী করিতে পারিল না। যদি সংসারে একজনকেও সুখী করিতে না পারিল, কেন তবে ভুবনের মৃত্যু হয় না! বিধাতা তবে কি উদ্দেশ্যে তাহাকে এ সংসারে পাঠাইলেন? ভুবন দেখে—বনদেবীর স্নেহ অসীম, তাঁহার স্নেহ ক্ষুদ্র। বনদেবীর হৃদয় নিঃস্বার্থ—তাঁহার হৃদয় স্বার্থভরা। ক্ষুদ্র প্রেম হৃদয়ে ধরিয়া সে তবে অনন্ত-প্রেমের প্রতিদান কি করিয়া দিবে? স্বার্থভরা হৃদয় লইয়া নিঃস্বার্থ হৃদয়কে কি করিয়া সুখী করিবে! তিনি বরং বনদেবীর শুভ্র, নির্ম্মল প্রাণের সুখ আপনার মলিনতা দিয়া দিন দিন ঢাকিয়া দিতেছেন, তাঁহার অশান্তির আঁধার দিয়া বনদেবীর চির-হাসিময় প্রাণের শান্তি নষ্ট করিতেছেন।

এদিকে রজনী নিস্তব্ধে বহিয়া যাইতে লাগিল। বাঁশবনে শৃগালগুলা উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া থামিয়া গেল। জমিদার

বাড়ীর নহবতখানায় মূলতানরাগ বাজিয়া-বাজিয়া স্তব্ধতার প্রান্তে মিলাইয়া গেল।

ভুবনমোহন অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিলেন, শেষে চক্ষের জল মুছিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। যেন কত দুর্ব্বল, যেন কোন দুর্দ্দমনীয় পীড়ার করাল গ্রাসে পড়িয়া অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছেন।

(৩)

বেলা প্রায় অবসান—এই সময় যদুনাথ রায় অন্তঃপুরে গৃহিণীর কক্ষে গমন করিলেন। গৃহিণী ঠাকুরাণী তখন ছোট একখানি কাপড়ে জরির কাজ করিতেছিলেন। এখনকার সুন্দরী পাঠিকারা হয় ত এই কথা শুনিয়া কিছুতেই হাসি সম্বরণ করিতে পারিবেন না। ভাবিবেন, অত বড় জমিদারের স্ত্রী আবার নাকি সামান্য দরজির মত কাপড়ে ফুল তুলিতেছিলেন! এখন একথা হাসির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তখন এখনকার মত দিন, কাল বা সভ্যতা ছিল না। তখন রাজা হউন, রাণী হউন, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হউন, সকলেই জানিতেন, হস্তপদবিশিষ্ট মনুষ্য মাত্রকেই উপযুক্ত ও পারগতা অনুসারে কাজ করা চাই। এখনকার মত তখন বিলাস-তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়া স্বপ্নহীন নিদ্রায় কাল কাটানকে ঘোর দুর্নীতি বলিয়া গণ্য করা হইত।

যদুনাথ গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বড় যে বাহার দিয়ে বসিয়া আছ, রূপে যে গৃহ আলো করিয়া রাখিয়াছ !"

গৃহিণী ঠাকুরাণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "হুঁ, অন্ধকার হতে আলোয় আন্‌বো ব'লে।"

যদু। (হাসিয়া) আলোয় গেলে যে পুড়ে মরিব।

গৃহিণী। বালাই।

যদু। তবে ঝল্‌সে যাব।

গৃ। আজিও কি ভাণ আছ নাকি ?

যদু। কেন, এমন কোন্ গুণে কি করিয়াছ ?

গৃ। কেন, এই নয়নগুণে !

যদু। ঠিক বলেছ, তোমাদের নয়নবাণে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হয়। মানুষ ভেড়া হয়।

গৃ। (হাসিয়া) তবে তোমায় হানি ?

যদু। আজিও কি বাকী রেখেছ !

আমাদের অনেক নবীন পাঠক যদুনাথের সহিত গৃহিণীর এ রহস্যালাপ পাঠ করিয়া বিরক্ত হইবেন, বোধ হইতেছে। বুড়োবুড়ীর প্রণয় ঘটিত কথা লিখিয়া বইখানাকে কলঙ্কিত করা কেন—ছিঃ ! এতক্ষণ দুটা যুবক যুবতীকে খাড়া করিয়া এরূপ করিলেও বা কতকটা ভাল লাগিত। তদুত্তরে আমি যদি বলি, এস্থলে উহাদিগের কথাগুলা বাদ দিলে বইখানার অসম্পূর্ণতা রহিয়া যায় ; আর যাহা সত্য তাহা লিখিতে দোষ কি ? বিশেষতঃ রূপোন্মত্ত যুবক যুবতীর প্রণয় হইতে বুড়োবুড়ীর প্রণয় খাঁটী সোণা—তাহাতে ভক্তি, প্রীতি, দয়া, স্নেহ, মমতা সকলই বর্ত্তমান !—হোক্, তুমি ছাড় মান। খাঁটি সোণায় আমাদের

কাজ নাই বাপু। কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল। পার' ত অন্য কথা বল, না পার কলম বন্ধ কর। পাঠকের এ কথা যেন আমার কর্ণে বজ্র হেন লাগিল, কিন্তু কি করি, তোমাদিগের মনোরঞ্জন করাই যখন আমার উদ্দেশ্য, তখন এ কথা ছাড়িলাম। স্থির হও, আর দু'টি পাতা পড়—বিরহিণী যুবতীর ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস তোমাদের গায়ে লাগাইতেছি।

যদুনাথ বলিলেন, "তোমাকে একটা কথা বলিতে আসিয়াছি। বনদেবীর বিবাহের আর পাঁচদিন মাত্র সময় আছে, এখনও সম্মতি দাও। সম্মতি না দিলেও যে এ কার্য্য বন্ধ থাকিবে তাহা নহে। নবাব যখন জিদ করিয়াছেন, তখন এ কার্য্য করিতেই হইবে। নইলে আমার শির থাকিবে না।"

গৃ। তাই বলেই কি মুসলমানে হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করিবে? ধর্ম্ম কি নাই?

এমত সময়ে চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে সেই গৃহে একটী যুবক প্রবেশ করিলেন। যুবকটির বয়ঃক্রম অনুমান অষ্টাবিংশ বৎসর। মুখ-ভাব প্রস্ফুট, পরিপাটি। দেহায়তন বেশ বলিষ্ঠ, অঙ্গে বহুমূল্য পরিচ্ছদ শোভা পাইতেছিল। ইনি জমিদার যদুবাবুর ভ্রাতা সতীশচন্দ্র।

সতীশচন্দ্র "দাদা, দাদা" বলিয়া যদুনাথের পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অন্য কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

যদুনাথ স্নেহাকুলিত হৃদয়ে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া বলিলেন, "বল, বল! কি হইয়াছে ভাই?"

সতীশ। আপনি নাকি নবাবের সহিত—মুসলমানের সহিত বনদেবীর বিবাহ দিবেন?

যদুনাথ বলিলেন, "এই—"

সতীশ। দেশে মহা হুলস্থুল পড়িয়াছে, জাতিনাশ ভয়ে হিন্দু প্রজাকুল শঙ্কিত। মুসলমানের সহিত হিন্দুর মেয়ের বিবাহ! দাদা! বড় কলঙ্ক—বড় লজ্জা!

যদু। আমি তাহা বুঝি সতীশ, কিন্তু নবাব যখন জিদ করিয়াছেন, তখন কাহার সাধ্য অন্যথা করে?

সতীশ। হিন্দু হইয়া, হিন্দুশোণিত শরীরে থাকিতে, হিন্দু ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিব?

যদু। রাজ্যের আশা, জীবনের আশা ত্যাগ করিতে পারিবে?

সতীশ। হিন্দু হইয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালন জন্য জীবন পরিত্যাগ—রাজ্য পরিত্যাগ অতি তুচ্ছ কথা।

যদু। সতীশ তুমি বালক, তাই ওরূপ কথা বলিতেছ। রাজ্য ও জীবন পরিত্যাগ করিয়া জাতি লইয়া থাকিয়া কি করিব?

সতীশ। জীবনটাত ছেলের হাতে মোয়া নহে, যে তাড়া দিলেই ফেলে দিবে? কেন আমাদের কি সৈন্যসামন্ত নাই? আমাদিগের বাহুতে কি বল নাই?

যদু। সতীশ! তুমি অল্পবুদ্ধি বালক। নবাব সিরাজ উদ্দৌলার নিকট বাহুবল! সুদারুণ স্রোতাস্বিনীর গতি শুষ্ক তৃণের ন্যায় নবাবের নিকট কোথায় ভাসিয়া যাইবে, তাহা কেহ দেখিতে বা শুনিতেও পাইবে না।

সতীশ। হউক, না হয় জাতীয় জীবন রক্ষার্থে আত্ম-বলিদান দিব। দাদা! যখন জন্ম হইয়াছে, তখন মরিতে একদিন

হইবেই! বিছানায় শুইয়া রোগে মরিতাম, না হয় ধর্ম্মের জন্য—জাতীয় জীবনরক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

সতীশচন্দ্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় যদুনাথের রুদ্ধ উৎসাহ খুলিয়া গেল, আর ধৈর্য্য রহিল না। তাঁহার সমস্ত আশা, ভরসা একটা সামান্য বাঁধে যেন বাধিয়া গেল, তিনি তাই অজ্ঞান,—তাই উন্মত্তের মত হইয়া পড়িলেন। যে মুহূর্ত্তে দ্যুলোক, ভূলোক, বিশ্ব-চরাচর সমস্তই ক্ষুদ্র এক 'আমার' বিরোধী বলিয়া সমস্তকেই শত্রু মনে হয়—আমার জন্য, স্বার্থের জন্য যে মুহূর্ত্তে অমৃতকে বিষ বলিয়া মনে হয়—দয়া, করুণা, ন্যায়, বিবেক, সকলি যে মুহূর্ত্তে বিদ্রোহী হৃদয়ের কাছে পেষিত হয়; যদুনাথের সেই মুহূর্ত্ত। তিনি সতীশচন্দ্রকে উচ্চ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সতীশ! তোমরা কেহ আর এ কার্য্যে বাধা দিওনা। ইহাতে আমি কাহারও কথা শুনিব না। আমি নিশ্চয়ই নবাবের সহিত বনদেবীর বিবাহ দিব—ইহা আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!

সতীশ তখন কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, "দাদা! তবে সতীশকে বিদায় দিন! সতীশ, এ পাপবিবাহের পূর্ব্বে নির্ব্বাসিত হইবে।"

যদু। কেন সতীশ, তোমার এমন কি অসুখ হইল!

সতীশ। কলঙ্ক—লজ্জা—অপমান—ঘৃণা—জাতিনাশ! নহে কি?

যদু। তবে তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার।

সতীশচন্দ্র চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেলেন।

গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "প্রাণেশ্বর, কি করিলে? কাহাকে নির্ব্বাসিত করিলে? সতীশ—সতীশ যে গুণের সাগর,

স্নেহের ভাণ্ডার, ভক্তির আধার, ধর্ম্মের আবাহ, বীরত্বের আদর্শ, হৃদয়েশ্বর! অমন ভাই কি আর পাবে।"

যদুনাথ রক্তিম নয়নে, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "যে এ বিবাহে বাধা দিবে, তাহারই ঐ দশা হইবে।" বলিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

(৪)

বাটীর বিবিধ বিঘ্ন জন্য যদুনাথ কাজী সাহেবের নিকট হইতে আর একপক্ষ সময় চাহিয়া লইয়াছেন। যেদিন বিবাহ হইবে কথা ছিল, কাজেই সেদিন পিছাইয়া পড়িল। সতীশচন্দ্র ইতি-পূর্ব্বেই "যদি এ পাপ বিবাহ হয়,তবে আর এ পাপ পুরীতে আসিব না" বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। বাটীতে সকলেই বিষাদিত; দেশের হিন্দু প্রজাকুল শঙ্কিত।

আর হতভাগিনী বনদেবী! বনদেবী দিন দিন উন্মুলিতা লতা গাছটীর ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। সে সারাদিন প্রায় একাকিনী জানালার ধারে বসিয়া শূন্য দৃষ্টিতে গাছপালার পানে চাহিয়া থাকে, হুহু করিয়া চোখ দিয়া জল পড়ে—কাহারো পায়ের সাড়া পাইলেই চোখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া যায়। বনদেবী আর সহ্য করিতে পারে না: উথলিত অশ্রু-উৎস মুছিয়া আর ক'দিন থাকিবে?

দশ বার দিন হইল, ভুবন চলিয়া গিয়াছেন। চারি পাঁচ দিন মধ্যে একবার আসিবার কথা ছিল, এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার কোন

সংবাদই নাই! দেওয়ানজী সেদিন যেরূপ যাহা বলিলেন, বুঝি তিনিই বা ভুবনের কোন অমঙ্গল সাধন করিলেন, নতুবা তাঁহার একটী সংবাদও পাই না কেন? দিন দিন বনদেবীর বুকে পাষাণ ভার বাড়িতেছে, দিন দিন তাহার ক্ষীণদেহ ক্ষীণতর হইতেছে —মলিন মুখকান্তি শীর্ণ, বিবর্ণতর হইয়া পড়িতেছে। সে যে আশার বলে বল আনিয়া, পাষাণ বলে প্রাণ বাঁধিয়া, তবুও ধৈর্য্য সহকারে আশার পানে চাহিয়া আছে—কিন্তু আর ত সে পারে না; প্রতিদিন কত কষ্টে কত করিয়া এক একটা দীর্ঘ যুগের মত যখন বেলাটা শেষ হইয়া যায়, মুহূর্ত্ত, পল গণিয়া গণিয়া সারাদিনের পর যখন সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু দিগন্তে বিলীন হইয়া পড়ে—তখনও ভুবনের কোন খবরই আইসে না। সে আর এমন করিয়া কত সহিতে পারে? এদিকে দিন দিন কাল-বিবাহের দিন সন্নিকট হইয়া আসিল। ভুবন! ইহার মধ্যে কি একবার তুমি আসিয়া জন্মের মত দেখা দিয়া যাইবে না? মর্ম্মান্তিক কষ্টে, দুঃখে বনদেবী বসিয়া ভাবিতেছে, এমন সময় সেই গৃহে একটি যুবতী প্রবেশ করিল। যুবতীর নাম সরোজা। অতি শৈশবাবস্থায় সরোজা পিতৃমাতৃবিহীন হইয়াছিল, যদুনাথ তাহাকে গৃহে আনিয়া প্রতিপালন করিতেন। আশা আছে, সতীশের সহিত সরোজার বিবাহ দিবেন। সরোজা ও বনদেবীতে অত্যন্ত প্রণয়। সরোজা গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "সখি!"

বনদেবী তখন গাঢ় চিন্তায় মগ্ন, শুনিতে পাইল না।

সরোজা পুনরায় ডাকিল, "সখি!"

বনদেবী এবার শুনিতে পাইল, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলিল, "এস।"

সরোজা। তোমার বড় কষ্ট হইতেছে, না ?

বনদেবী। বুক চিরিয়া দেখাইবার হইলে দেখাইতাম।

সরোজা। ধর্ম্মে মতি রাখ, ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন।

বনদেবী। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।

সরোজা। কেন মুসলমানের সহিত বিবাহ করিবে ? কেন ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিবে ? তুমি অত উতলা হইও না যখন যাহা করিতে হয়, আমিই পরামর্শ দিব। কিন্তু সাবধান, আমাকে না বলিয়া কোন কর্ম্মই করিও না।

বনদেবী। না। কিন্তু মনে থাকে যেন—তুমিই আমার ভরসাস্থল।

সরোজা। ভুবনের কোনও সংবাদ পাইয়াছ ?

বনদেবী। কিছু না।

সরোজা আর কিছু বলিল না, উঠিয়া অপর একটা কক্ষে প্রবেশ করিল এবং একটা বীণা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বীণায় সুর বাঁধিয়া কপোল-পতিত চুলের রাশি সরাইয়া বলিল, "বনদেবি ! একটা গান গাও না।

বনদেবীর হৃদয় যাতনায় অস্থির ! নিরাশ-সমীরে সদ্যবিকসিত প্রসূন ছিঁড়িয়া যাইতেছে। অনেক কষ্টে, দুঃখে সে বলিল, "আমি আর কি গাহিব ?"

সরোজা। গাও একটি, তবুও ক্ষণকালের জন্য মন শান্ত থাকিবে।

সঙ্গীত—রোগের ঔষধ, ভয়ের সাহস, শোকের সান্ত্বনা, জীবন মরুভূমের ওয়েসিশ্। সুতরাং আনন্দে হউক, দুঃখে হউক, রোগে হউক, শোকে হউক সকলেই সঙ্গীত ভালবাসে। এত

দুঃখেও বনদেবী একটি হৃদয়গন্ডভাবে—বসন্ত-সায়াহ্নসমীরণের ন্যায় উদাস ভাবে গঠিত গান গাহিতে আরম্ভ করিল। সরোজা বনদেবীর হস্তে বীণাটি দিয়া নিজে একটি বাঁশী বাজাইতে লাগিল। সুন্দর বামাকণ্ঠের সহিত সুন্দর স্বর, তাহাতে লয় সংযোগ, আবার তাহাতে মধুময় সান্ধ্য-পবনে মধুর উচ্ছ্বাস—এক মধুময় ভাবে পূর্ণ হইল। বনদেবী গাহিতে লাগিল,—

মনকে বুঝাতে চাহি, মন ত বোঝে না সই।
বহিছে মলয় বায়, গুঞ্জরিছে ভ্রমরায়,
কাননে কুসুমচয়, সৌরভে ফুটিল ওই—
মনকে বুঝাতে চাহি, মন ত বোঝে না সই!
উদিল আকাশে চাঁদ ভেঙ্গে গেল হৃদি বাঁধ
সোণারি সে মুখ চাঁদ, পরাণ আকুল হ'ল—
এখনি আসিবে বলে, কত দিন গেছে চ'লে,
'এখনি' কাহাকে বলে—আমাকে বুঝায়ে বল।
কতদিন হ'য়ে গেল, 'এখনি' ত নাহি হ'ল,
অভাগী পরাণে ম'ল, তথাপি সে এল কই!
মনকে বুঝা'তে চাহি, মন ত বোঝে না সই?
হৃদি খুলে ভালবেসে, এই কিলো হ'ল শেষে,
আঁখি জলে ভেসে-ভেসে, জীবনের হলো শেষ;
সে কঠিন নিরদয়, বিসর্জ্জিয়ে মমতায়,
অভাগিরে ভুলি হায়, রৈল কোন্ দূরদেশ।
ভাসি আমি দুঃখনীরে, সে কভু না চায় ফিরে,
তথাপি সে মু'খানিরে ভুলিতে পারিনু কই?
মনকে বুঝা'তে চাহি, মন ত বোঝে না সই!

এই গানটি মিশ্র কাফি-রাগিণী ও একতালা তালে গেয়

(৫)

যদুনাথ আর কাহাকেও বুঝাইয়া পারে না। কেবল এক দেওয়ানজী এ বিবাহের সাপক্ষে, নতুবা আর যে শুনিতেছে, সেই অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ বিবাহের জন্য সতীশচন্দ্র গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, গৃহিণী গৃহে বসিয়া দিবারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইতেছেন, বনদেবী দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দেশের মধ্যে ইহা লইয়া ভারী একটা হুলস্থুল বাঁধিয়া গিয়াছে। যদুনাথ এজন্য বড় বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। ইচ্ছা করিলে এ বিপদ হইতে তিনি সহজেই মুক্তিলাভ করিতে পারেন, কিন্তু স্বার্থতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নবাবের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি জমিদারী-ভিত্তি দৃঢ় করিবেন, দেশের মধ্যে একটা প্রতিপত্তি স্থাপন করিবেন। স্বার্থ আসিয়া যখন মনুষ্য হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করে, তখন মানুষ—মান, সম্ভ্রম, জাতি, কুল, পদমর্য্যাদা, স্নেহ, ভালবাসা, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকলি সেই স্বার্থ-পদতলে বলিদান দিতে পারে। যদুনাথ এখন সেই স্বার্থের বশীভূত, তিনি এখন সব ভুলিয়াছেন। কিসে স্বার্থ বজায় থাকিবে, সেই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত।

একটা নিভৃত গৃহে যদুনাথ রায় ও দেওয়ানজী বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। বলা বাহুল্য, নিভৃত স্থলে বসিয়া ঐ বিবাহ বিষয়ক কথাবার্ত্তাই হইতেছিল।

যদুনাথ বলিলেন, "আরত পারি না।"

দেও। লোকের ইহাতে যে কি হইতেছে, তাহা ত' বুঝি না।"

যদু। কিরূপে জানিব? একটা উপায় ত স্থির করা চাই?

দেও। অন্য উপায় ত' আর কিছুই দেখি না—তবে একটা পথ আছে।

যদু। কি, বল।

দেও। কাজী সাহেবকে এক পত্র লেখা হউক, তাহার লোকজন আসিয়া বনদেবীকে বলপ্রকাশে হরণ করিয়া লইয়া যাউক। আমরা যেন সাধ্যানুসারে তাহাকে রাখিতে পারিলাম না,—তাহার পর সেখান হইতে নবাববাড়ী প্রেরণ করিলেই চলিবে। তবে কাজীকে এইটুকু বলিয়া দিলেই চলিবে যে, বনদেবীকে লইয়া গিয়াই যেন সেখানে না পাঠান হয়। পাঁচ সাতদিন কাজীবাড়ী রাখিয়া বনদেবীকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া শেষে পাঠাইয়া দিলেই ভাল হইবে। এখানে থাকিয়া বনদেবীকে যেরূপ অনভিমত প্রকাশ করিতে দেখিতেছেন, সেখানে গেলে ততটা থাকিবে না। যেহেতু এখানে কতকগুলি কেন্দ্রী আছে, তাহারা সর্ব্বদাই উহার মন খারাপ করিয়া দেয়। আমার মতে এ পরামর্শ মন্দ নহে। সহজে—আমোদে-আহ্লাদে এ বিবাহ সম্পন্ন হইবে না।

যদুনাথ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "ক্ষতি কি, তাহাই কর।"

দেওয়ানজী বাহির হইয়া গেলেন।

(৬)

কুটিরের দম্পতি যুগলের কথা হইতেছিল। পুরুষ বলিল, "বড় অন্যায় হইয়া গেল, জানিয়া শুনিয়া কথাটা বনদেবীর

কর্ণগোচর করান হইল না। কিন্তু কি করিব, সুযোগ মাত্র পাইলাম না।”

স্ত্রী। কেন, তোমার এত কি মাথা ব্যথা পড়িয়াছে ?

পুরুষ। যিনি আমার বিপদের কাণ্ডারী—যাঁহার প্রসাদে আমি আজি সংসারে রহিয়াছি—যাঁহার দয়ায় তোমার জীবন পাইয়াছি, তাঁহার একটা ভয়ানক বিপদের কার্য্য সংঘটিত হইতে বসিয়াছে জানিয়া শুনিয়া আমি তাহার কোন একটা উপায় স্থির করিতে পারিলাম না—ইহা কি কম দুঃখের কথা !

স্ত্রী। আমি তোমার কথা ত' বুঝিতে পারিলাম না, আমার ন্যায়রামের সময় বনদেবী কি তোমাকে কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন ?

পুরুষ। না, যিনি তোমায় জীবন দিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে ও বনদেবীর জীবনে একসূত্রে গাঁথা।

স্ত্রী। (সবিস্ময়ে) যাঁহার দয়ায় আমি আবার তোমার চরণ সেবা করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেছি, তিনি কি জমিদার যদুনাথ রায়ের জামাতা ? তিনি কি বনদেবীর স্বামী ? বনদেবীর কি বিবাহ হইয়াছে ?

পুরুষ। না, আমাদিগের বিপদ্‌কাণ্ডারী জমিদার-জামাতা নহেন, তিনি দুঃখীর সন্তান—দেবতা ! বনদেবীর বিবাহ হয় নাই ; কিন্তু তিনি বনদেবীর প্রেমাকাঙ্খী, বনদেবী তাঁহার প্রেমপাগলিনী। সুতরাং বনদেবীর বিপদে তাঁহারও বিপদ।

স্ত্রী। আহা, তাঁহার যেরূপ গুণরাশি, তাহাতে তাঁহাকে পূজা করিতে, ভক্তি করিতে, বনদেবী কেন—স্বর্গের দেবীরও

ইচ্ছা করে। তা তুমি কেমন করিয়া জানিলে, বনদেবী ও তিনি প্রণয়াবদ্ধ !

পুরুষ। যে রাত্রে তিনি বৈদ্য আনিয়া দিয়া গেলেন, তাহার পর দিবস একগাছি বহুমূল্য অনন্ত আনিয়া আমাকে বলিলেন, 'এই গাছি বন্ধক দিয়া কোথাও হইতে আমাকে কিছু টাকা আনিয়া দিতে পার ?' পূর্ব্ব রাত্রের কথা স্মরণ করিয়া আমার গাত্র লোমাঞ্চিত হইল, বলিলাম, "পারি।" তিনি অনন্ত গাছটি আমার হাতে দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কাহার অনন্ত ?" অকপটি অকপট চিত্তে সমস্ত কথা আমায় বলিলেন। আমি তাহা বন্ধক রাখিয়া তাঁহাকে একশত মুদ্রা আনিয়া দিলাম. তাহা হইতে বিংশতি মুদ্রা আমায় দিয়া বলিলেন, 'ইহার দ্বারা তোমার স্ত্রীর চিকিৎসা করাইও। তোমাকে কিছু দিবার জন্যই উহা এখানে বন্ধক দেওয়া হইল, নচেৎ গ্রামে গিয়া দিলেও পারিতাম।' সে অনন্ত বনদেবীর ! প্রণয়ীর বিপদে প্রণয়িনীর হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়াছে—প্রণয়ীর অর্থাভাবে প্রণয়িনীর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছে, তাই নিজাঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া দিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

স্ত্রী। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি বনদেবীর স্বামী হউন। বনদেবী তাঁহাকে স্বামীত্বে বরণ করিয়া অনন্ত শান্তি লাভ করুন।

যখন দম্পতি-যুগলে কথা হইতেছিল, তখন রাত্রি দ্বি-প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিসাড়া নিঃশব্দ জগৎ ঝাঁ ঝাঁ রব করিতেছে।

তাহারা কথোপকথন করিতে করিতে শুনিতে পাইল, নৈশ

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অদূরে ঘোর মনুষ্য কোলাহল হইতেছে! পুরুষ বলিল, "শুনিতে পাইতেছ, ঐ বুঝি বনদেবীকে হরণ করিতে কাজী সৈন্যেরা আসিয়াছে! তুমি বস', আমি দেখিয়া আসি" বলিয়া গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

যুবক সে স্থলে উপনীত হইয়া দেখে, কাজী-সৈন্যগণ ফিরিয়া যাইতেছে। বনদেবী বন্দিনী হইয়াছেন দেখিয়া যুবকের মাথায় যেন শত বজ্র পতিত হইল, চক্ষু দিয়া প্রবল বেগে জলের ধারা বহিতে লাগিল। সে তখন স্তম্ভিত হইয়া পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিল। দেখিতে দেখিতে লোকজন সব চলিয়া গেল। সেস্থান আবার নিরবতা অবলম্বন করিল। তখনও যুবক সেইভাবে সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। অদূরে বকুল গাছের ডাল হইতে একটা পেচক কর্কশকণ্ঠে বিকৃত স্বরে ডাকিতে লাগিল। শিবাগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। সে শব্দে যুবক চমকিল! চোখের জল মুছিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ক্ষণিক যাইতেই দেখে, পথপার্শ্বে একটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী যুবতী আলুলায়িত বেশে, মাটীতে পড়িয়া লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতেছে। দেখিয়া যুবকের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল—মৃদুমধুরস্বরে কহিল, 'আপনি কে? নির্ভয়ে আমার কথার উত্তর প্রদান করুন, আমি আপনার ভৃত্য বা সন্তান।" সে কথা যুবতীর কর্ণে পৌঁছিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো, আমি বনদেবীর সখী হতভাগিনী সরোজা। ওগো, আমার প্রিয়সখীকে লইয়া গেল। আমার সখী যে আমারই আশ্বাসে নিশ্চিন্ত ছিল—নতুবা ত' সে ইতিপূর্ব্বেই আত্মহত্যা করিয়া মুসলমানের অত্যাচার হইতে অব্যাহিত পাইত। বল গো, কি উপায়ে আর একটি বার

সে মুখখানি দেখিতে পাই! আমার কোল হইতে যে সে লতিকাটিকে ছিন্ন করিয়া লইয়া গিয়াছে! সে প্রাণভেদী কান্না, হায় রে! কেমন করিয়া ভুলিব?"

যুবক বলিল, "না, অধীর হইয়া কি করিবেন? এখন যদি ইচ্ছা হয়, নিকটেই এ দরিদ্রের কুটির আছে, সেই স্থানে চলুন, প্রকৃতিস্থ হইয়া যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন।"

"চল" বলিয়া সরোজা উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইল, কিন্তু এক পাও অগ্রসর হইল না, আর কাঁদিলও না। নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ মূর্ত্তি—বড স্থির, বড় গম্ভীর। যুবক একাগ্রচিত্তে নির্নিমেষ নয়নে সে মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সরোজা একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "আমায় একটা অশ্ব আনিয়া দিতে পার?"

যুবক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিল, "অশ্ব কেন? আপনি কি তাহাতে উঠিয়া কোথাও যাইবেন? আপনি কি অশ্বারোহণ-কৌশল অবগত আছেন?"

সরোজা বিলোল-কটাক্ষে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, আমি অশ্বে চড়িয়া যাইব, অশ্বারোহণ করিতে আমি ও প্রিয়সখী দুইজনেই জানি। মহাশয়! আমাদের এ কমনীয়-করতলে করালসম কৃপাণেরও নিতান্ত অপমান হয় না। তবে কি বলিব, কর্ত্তার যোগে আমাদের নিদ্রিতাবস্থায় আসিয়া সখীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। নতুবা শত্রু রক্তে, সতীর রক্তে মাতৃভূমির চরণ ধৌত করিতাম।" বলিতে বলিতে যুবতীর ক্রোধাবেগ দ্বিগুণতর হইল। তখন সে কমনীয় কুসুম-কান্তি মহাভয়ঙ্করীরূপে পরিণত হইল। সে রূপ দেখিয়া যুবকের হৃদয়ে কি একরূপ ভাবের আবির্ভাব

হইল। গদগদকণ্ঠে কহিল, "মা, ও রূপ সম্বরণ কর, ওরূপে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় হয়; মুসলমান ত কোন্ ছার!" সরোজা অপ্রতিভ হইল—যেন লজ্জাবতী লতার গায়ে গোপনে কে হাত দিল।

সরোজা জড়সড় হইয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "মহাশয়, বড় দুঃখে—বড় শোকে কি বলিতে কি বলিয়াছি, কিছু মনে করিবেন না। এক্ষণে আমার প্রার্থিত অশ্বটি কি আনিয়া দিতে পারিবেন? আমি কাজীবাড়ীতে সখীকে—উন্মূলিতা-লতাকে দেখিতে যাইব।"

যুবক উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "আমি অশ্ব কোথায় পাইব? আমি নিতান্ত দরিদ্র।"

সরোজা বলিল, "আমাদের অশ্বশা[illegible] যদি আনিয়া দিতে পারেন।"

যুবক। রক্ষকগণ দিবে কেন?

"আমার নিজের অশ্ব আছে, এই নিদর্শন লইয়া গিয়া অশ্ব রক্ষককে দিলেই সে ঘোড়া দিবে। আমি নিজের অর্থে উহা কিনিয়া রাখিয়াছি।" এই বলিয়া সরোজা একটা অঙ্গুরী খুলিয়া যুবকের হস্তে দিল। যুবক বলিল, "আপনার এস্থলে থাকা উচিত বোধ হইতেছে না। চলুন, আপনাকে আমার গৃহে রাখিয়া আমি অশ্ব আনিতে যাইতেছি।" সরোজা যুবকের সহিত যুবকের গৃহে গমন করিল। যুবক তাহাকে স্ত্রীর নিকট রাখিয়া অশ্ব আনিতে চলিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বেই সুসজ্জিত এক বেগবান অশ্ব আনিয়া উপস্থিত করিল।

সরোজা বলিল, "একটা পুরুষের পোষাক চাই। এই

অলঙ্কারগুলি লইয়া দোকান হইতে আমাকে সৈনিক পুরুষের পোষাক আনিয়া দিন।”

যুবক বাজার হইতে পোষাক আনিল। সরোজা সে পরিচ্ছদ পরিল, মস্তকে উষ্ণীষ দিল। যুবক বলিল, “আমার জ্ঞান হইতেছে, এ সৈনিক-বেশ অত্যাচারীর বংশ বিনাশমূলক।”

সরোজার বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটিল। সে হাসিয়া বলিল, “ধর্ম্ম আমার সহায় হউন, আমি যেন প্রিয়সখীকে উদ্ধার করিতে পারি। না পারি, তবুও যেন উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া আর্য্য-ধর্ম্মে থাকিয়া, আর্য্যধর্ম্মের পদতলে জীবন দান করিতে পারি। মহাশয়, এখন তবে চলিলাম—ভরসা করি, একদিন দেখা হইবে।”

যুবক বলিল, হাঁ, হয় ত' একদিন দেখা হইবে।”

সহসা সে নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কোথা হইতে জলদ-গম্ভীর স্বর উঠিল, “হাঁ! একদিন দেখা হইবে। হিন্দু মুসলমানের মহা সমরক্ষেত্রে একদিন দেখা হইবে।” সচকিতে সকলে সে স্বরের প্রতি লক্ষ্য করিল! জ্যোৎস্নালোকে দেখিল, সতীশচন্দ্র অশ্বারোহণে! বীর পরিচ্ছদপরিধারী সতীশচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “সরোজা, পোড়ারমুখী, আয়—মুসলমান সমরে মরিতে যাবি?”

সরোজা সে সময়ে সতীশচন্দ্রের সমাগমে বড় অপ্রতিভ হইল। প্রাণের ভিতর একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া সমাধা হইয়া গেল, বলিল, “যা'ব।”

“আয় তবে” বলিয়া সতীশচন্দ্র তীরবেগে অশ্ব চালিত

করিলেন। সরোজাও নিমেষ মধ্যে অশ্বে উঠিয়া কুমারের অনুসরণ করিল।

---

(৭)

নীল-নীরদ-খণ্ডবৎ অনন্তবিস্তৃত—অশ্রান্তবাহী কুমার নদ কলকল স্বরে হৃদয়ের কি এক স্বপ্নময় গান গাহিতে গাহিতে ধীরতরঙ্গ বিক্ষেপে—কে জানে কোথায় বহিয়া চলিয়াছে। সেই গানে মজিয়া, ঊর্ম্মির পর ঊর্ম্মি জড়াজড়ি করিতে করিতে তালে তালে নাচিতেছে। তীরস্থ বৃক্ষ লতাগুলি অবাক হইয়া নিথর, নিশ্চল —দাঁড়াইয়া তাহা দর্শন করিতেছে। শাখী-শিরে দলে দলে জোনাকীপোকা জ্বলিতেছে, কুসুম-বাস নৈশ-সমীরণে মিশিয়া দিগন্তর ছুটিতেছে।

অদূরে প্রকাণ্ড শ্মশান। এই শ্মশানে—কে জানে কতদিন, কত বর্ষ ব্যাপিয়া কত শত সুন্দর দেহের সমাধি হইয়া গিয়াছে। এই শ্মশানে—কত স্নেহময়ী জননীর নয়ন-মণি পুত্র রত্ন, কত উন্নত চরিত্রের চরমাদর্শ পিতার দেহ, কত প্রণয়ীর হৃদয় পিঞ্জরের পোষিত পক্ষিণী, কত সতীর হৃদয়দেবতার—কত ভ্রাতৃবৎসল ভায়ের প্রাণের কুসুমগুচ্ছ এই স্থানে—এই শ্মশানভূমে শেষ সমাধি হইয়া গিয়াছে। মানব! একবার এই শ্মশানে আসিয়া ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি কি? যে উপাদানে তোমার দেহ গঠিত, সেই উপাদানে ঐ প্রজ্বলিত চিতাস্থিত শবের দেহও গঠিত ছিল। সে ত' আজ পুড়িয়া এই শ্মশানে ভস্মরাশি হইল। তাহার কত যত্নের দেহ ত' আজি আগুণের কোলে লুকাইল.—তবে—তুমি?

তুমিও ত' একদিন যাইবে! কেন তবে হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি লইয়া সংসারে বিচরণ কর? কেন তবে মরণের পথে, দুঃখের পথে, বৈরাগ্যের পথে ইচ্ছা করিয়া যাও না? কেন মানুষ, সীমার পথে—অস্থায়ীত্বের পথে—পাপের পথে—আপন ইচ্ছায় যাও? যাহা চিরকাল তোমার নয়, তাহাকেই কেন প্রাণপণে আপনার ভাব? যাহা বিষ, তাহাকে আপন ইচ্ছায় সুধা বলিয়া কেন চুম্বন কর?—কেন ধন চাও, যশ চাও, সংসার চাও—কেন রিপু চরিতার্থ করিতে চাও? এ সকল ক'দিনের বল ত'? আজ আছে ত' কাল নাই। এক নিমেষের জন্য যাহা—তাহাকে লইয়াই কেন থাকিতে চাও? যে রিপু দু'দিন দশদিন বই থাকে না, তার পরিচর্য্যায় কেন ব্যস্ত থাক? ঐ যে অন্ধকার—গভীর হইতেও গম্ভীর—ঘন হইতেও ঘন ঐ যে অতলস্পর্শ সাগরের ন্যায় শোক, দুঃখ—ঐ যে শ্মশান!—আগুণ এবং কাঠ দিয়া মহা-নির্ব্বাণের মহাপাঠ লিখিতেছে, উহার ভিতরে কি তা জান? উহাই নবজীবনের আরম্ভ! শাস্ত্রে কি লিখিতেছে? "আগুণ-কালিতে ঐ মহা বৈরাগ্যের শ্মশান"—শাস্ত্র এই! ধুলি-মাটীর খেলা ছাড়—অনন্ত জীবনপথে অগ্রসর হও। আলোক ত' সীমাকে দেখাইয়া দেয়—আসক্তি ত' ক্ষুদ্রেরই পরিচয় দেয়। এ সকল লইয়া কেন চিরকাল ভুলিবে; চাহিয়া দেখ, অন্ধকার! অসীমের কাহিনী বলে বৈরাগ্য—অনন্তের রূপই দেখাইয়া দেয়। আলোক—সসীম ব্যঞ্জক, অন্ধকার—অসীমব্যঞ্জক। আলোক—স্বাধীনতার লক্ষ্য—অন্ধকার অধীনতার পরিণাম। দ্বি-প্রহর গভীরা অন্ধকার রজনী—মহাশ্মশানে মানুষের পরিণাম মহা-অক্ষরে লিখিত হইতেছে—"অনন্ত"। অনন্ত—কি? না, মানুষ

যাহা ধারণা করিতে পারে না। মরণ—কি? না, মানুষ যাহা বুঝিতে পারে না। অনন্তে ডুবাইবার জন্য আলোকের ধারে অন্ধকার, অনন্তের পথে লইবার জন্য, জীবনের ধারে মরণ। অনন্তের তত্ত্ব শিখাইবার জন্য, সংসারের কোলে শ্মশান। তাই অহঙ্কারী—সংসার-আসক্তি-নিমগ্ন মানুষ! তোমার পরিণাম ঐ অনন্তের পথ—ঐ মরণ আর ঐ শ্মশান। ক্ষুদ্র হইয়া কি মানুষ চিরকালই ক্ষুদ্র থাকিবে? না—তা নয়, অনন্তের শিশু অনন্তের পথ ধরিবেই ধরিবে। আসক্তি নয়—সুখ নয়—আলোক নয়—সীমা নয়—কিছুই মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য—ঐ অনন্ত। লক্ষ্য যাহা,—মানুষ জানে না তাহাই! লক্ষ্য—যার ভিতর মানুষ যাইতে চায় না তাহাই! কেন তবে মজিব? কেন আসক্তি বা সুখ, ধন বা যশ, আলোক বা সীমা, স্বাধীনতা বা নরক লইয়া বসিয়া থাকিব? চাই না—কিছুই চাই না। সংসার যাক্, মিলন যাক্, আনন্দ যাক্, শরীর যাক্, কিছুই চাহি না। আমার এক ইচ্ছা, আমি দাসানুদাস হইয়া—শ্মশানের কোলে মাথা রাখিয়া, অভয়ব্রত গ্রহণ করিয়া ঐ অনন্ত মরণকে স্পর্শ করিয়া ঢলিয়া পড়ি। আরও ইচ্ছা এই,—সামঞ্জস্য করিব। আলোকাধারের মাহাত্ম্য বুঝিব, স্বাধীনতা ও অধীনতার মর্ম্মভেদ করিব। আয় শ্মশান, আয় দুঃখ, আয় শোক, আয় মরণ, তবে তোরা আয়—আমার কাছে আয়। ভেদাভেদ নাশ কর্, স্ত্রী পুত্রের আসক্তি নির্ব্বাণ কর্—আমি সংসারে থাকিয়া তোকে চুম্বন করিয়া মহা-বৈরাগ্যের, মহাশাস্ত্রের মহতত্ত্ব বুঝি!

এই শ্মশানে বসিয়া একটি যুবক মাতার দেহভস্মকারী চিতার পানে চাহিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে চক্ষু দিয়া নীরবে দুই

এক বিন্দু প্রতপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে চিতার আগুণ নিবিয়া গেল। তখন ধীরে ধীরে যুবক উঠিল। যুবকের সঙ্গী কয়েকজনও তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। যুবক চিতা হইতে মাতার অস্থি কুড়াইয়া লইয়া পূত-সলীলে নিক্ষেপ করিল। সঙ্গীগণ শ্মশান-বৈরাগ্য হৃদয়ে সু-গুরু-গম্ভীর স্বরে "হরিবোল হরিবোল" ধ্বনি করিতে লাগিল। যুবক কলসী পূরিয়া পূত-সলিল আনিয়া চিতাঙ্গার ধুইয়া ফেলিল।

ক্রমে মাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করণান্তর যুবক সঙ্গীগণ সহ নিকটস্থ দোকানে যাইবেন;—এমন সময় একটি দুঃখিনী, তাহার হৃদয় সরসির প্রফুল্ল-কমল, জীবনের একমাত্র অবলম্বন শিশুপুত্রের শব বক্ষে করিয়া আলুলায়িত কেশে হৃদয় ভেদী স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্মশানে উপস্থিত হইল। সে দৃশ্য দেখিয়া যুবকের করুণ হৃদয়ে শেলবিদ্ধ হইল, চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু-প্রবাহ ছুটিল। আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। সে বিষাদিতা মূর্ত্তির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কথা কহিতে পারিল না। তখন সেই পুত্রশোকানল-দহ্যমানা ক্রন্দনপরায়ণা দুঃখিনী রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "আমি কেমন করিয়াই বা কি করি, হা বিধাতঃ! এ সুবর্ণ-কোরক আমি কেমন করিয়া জলে ফেলিয়া দিব? কেমন করিয়া কি করিব! আমি ত' কিছু জানি না" বলিয়া কাল-করচিহ্ন-মুকুল-শবকে শ্মশানভূমে নামাইল। তারপর—শবের পার্শ্বে লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতে লাগিল।

যুবকের সঙ্গীগণ ডাকিল, "ভুবন! আর দাঁড়াইয়া কি করিতেছ, এস।"

যুবককে পাঠক চিনিয়াছেন কি? যুবক আমাদিগের পরিচিত ভুবনমোহন।

ভুবন বাটী আসিয়া মাতার চিকিৎসা ও যথাসাধ্য সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বৃদ্ধদেহ-প্রবিষ্ট-ব্যাধি কিছুতেই উপশম হইল না। ক্রমে ব্যায়রামের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শরীর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইল; জীর্ণ-বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নববস্ত্র পরিধানের ন্যায় বৃদ্ধার আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিল। তখন ভুবন মহাবিপদ্গ্রস্ত হইল। ভুবনের বাড়ী হইতে শ্মশান প্রায় দুই ক্রোশ ব্যবধান—রাত্রি চারি দণ্ডের সময় মাতার মৃত্যু হইল। তখন কেমনে শ্মশানে লইয়া যাইবে, কেমনে মাতার ঔর্দ্ধ-দেহিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবে ইত্যাদি ভাবিয়া আকুল হইল। পাড়ার মধ্যে লোক ডাকিতে হইবে, কিন্তু শবের নিকট কাহাকে রাখিয়া যাইবে? শেষে প্রতিবাসিনী হরির মা বুড়ী শবের নিকট বসিল, ভুবন লোক ডাকিতে গেল। অন্য সময়ে যে বড় আত্মীয়তা দেখাইত, এখন আর ভুবন তাহারও সাহায্য পাইল না। বন্ধু রামচরণের বাড়ী যাইল, রামচরণ তখন গৃহে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিল। ভুবন ডাকিল, "বন্ধু, বাড়ী আছ?" বন্ধু উত্তর দিল। ভুবন বলিল, "আমার মায়ের মৃত্যু হইয়াছে, তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।" সে আমৃতা-আমৃতা করিয়া বলিল, "তাই ত'।" সেকথা শুনিয়া তাহার মাতা চটিয়া আসিয়া বলিল, "ভুবন, ওত' যেতে পারিবে না? একে ছেলে মানুষ, তাহাতে আজ পাঁচ দিন হইল ওর মাথা ধরিয়াছিল, তা

এমন অবস্থায় কি কেহ মড়া ছোঁয়—না ?" ভুবন সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রায়েদের বাড়ী যাইল। রায়েদের মতির সহিত ভুবনের আত্মীয়তা ছিল, তাহাকে বলিলে সে বলিল, "যাইতে আমার বিন্দুমাত্রও আপত্য ছিল না, তবে কেহ কেহ অনুমান করিতেছিল, এই মাসে আমার স্ত্রী গর্ভবতী হইবেন। সে স্থলে আমার কিরূপে যাওয়া ঘটিতে পারে ভাই ?" ভুবন আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সে স্থান হইতেও ফিরিল। এইরূপে যাহার যাহার সহিত আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব ছিল, সকলেরই নিকটে যাইল, প্রায় সকল স্থানেই ঐরূপ উত্তর পাইল। তখন হতাশহৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মাতার মৃত দেহের পার্শ্বে বসিয়া জানুদ্বয় মধ্যে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। হরির মা বুড়ী পরের দুঃখে দুঃখিত হয়, পরের চোকে জল দেখিলে তাহার চোকে জল আইসে। ভুবনের কান্না দেখিয়া সেও কাঁদিল। শেষে বলিল, "ভুবন, লোক পেলে না ?"

ভুবন। না।

হরির মা। তবে কি হ'বে ?

ভুবন। কেউত এলেন না, আমি একা আর এ রাত্রে কি করিব ?

"তবে তুমি বস, আমি দেখি।" বলিয়া বুড়ী উঠিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমার গঙ্গাজলের ছেলেকে ব'লে এলাম, তিনি পেয়াদা পাঠাইয়া দিলেন, লোক জুটিবে এখন।"

ভুবন। এখন এলে হয়।

বুড়ী। তুমি গরীব। দুঃখ জানাইয়া, কাতরতা জানাইয়া

ডাক—কেহই আসিবে না; যে ধনী, সে গালি দিয়া ডাকুক, পালে পালে দলে-দলে লোক আসিয়া জুটিবে। তুমি ডাকিতে গিয়াছিলে, কেহ আসে নাই, তাহার পেয়াদা ডাকিতে গিয়াছে, এখনি লোক আসিবে, সেজন্য তুমি আর ভেব না।

ভুবন ভাবিল—"হায় সংসার! তোমাতে কেহ কাতরের বন্ধু নাই কেন? দীনের প্রতিপালক কেহ হয় না কেন? বিপদের উদ্ধার কর্ত্তা জুটে না কেন? অত্যাচারীর হস্ত হইতে অত্যাচারিতের রক্ষাকর্ত্তা মিলে না কেন—কেন সংসার তোমাতে এত বৈষম্যের ছল!"

এই সময় শব শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য কতকগুলি লোক আসিয়া ভুবনের বাড়ী পৌঁছিল। কেহ কেহ শব বাঁধিতে আরম্ভ করিল, কেহ ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যোপযোগী দ্রব্যাদি গুছাইতে লাগিল। কেহ তামাকু খাইতে লাগিল, কেহ বক্তৃতা করিতে লাগিল, কেহ শব তীরস্থ করিয়া দোকানে গমনপূর্ব্বক কোন্ কোন্ উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিবে, মনে মনে তাহার কল্পনা করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সকলের কার্য্যই প্রায় শেষ হইল, তখন শব লইয়া 'হরিবোল' দিয়া বাটীর বাহির হইল—ভুবনও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। বুড়ী ছড়া দিয়া সে বাড়ী পবিত্র করিল।

শব লইয়া গমন করিতে করিতে এক প্রান্তরে জ্যোৎস্নালোকে ভুবন দেখিল, একখানি ছইঘেরা গরুর গাড়ী, তাহার মধ্যে কাহারা আকুলী-ব্যাকুলী করিতেছে! গাড়োয়ান বাহিরে দাঁড়াইয়া একজন মুসলমান পাইকের নিকট বিনীতস্বরে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ গাড়িখানি ছাড়িয়া দিতে

বলিতেছে। পাইক কিছুতেই স্বীকৃত না হইয়া অনবরত হিন্দি ঝাড়িতেছে, তাহাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া ভুবন সঙ্গীগণকে বলিল, "দেখ, দেখ, উহারা বড় বিপন্ন হইয়াছে।" সঙ্গীগণ হাসিয়া বলিল, "তা আমাদের কি?"

ভুবন। আহা! উহাদিগের এখন বড় বিপদ। তোমরা দাঁড়াও, আমি উহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়া আসি।

সঙ্গী। কি আপদ্। পরের ঝগড়া ঘরে আন কেন? চল, আমরা যাই।

ভুবন। বিবেচনা কর, এই রাত্রে আমাদের যদি ঐরূপ বিপদ হয়, তবে কিরূপ কষ্ট ও দুঃখ হয়।

সঙ্গী। আমাদের ত' আর হয় নি!

ভুবন। হ'য়েছে বৈ কি। একজনের কষ্ট হইলে সে কষ্ট কি সকলের হয় না? তোমার আমার কষ্ট কি ভিন্ন?

সঙ্গী। তুমি কি পাইকের নিকট হইতে উহাদিগকে মুক্ত করিতে পারিবে? এত রাত্রে উহারা বাঙ্গলার নিকট দিয়া গাড়ী লইয়া যাইতেছিল; তাই পাইকে ধরিয়াছে। তোমার সাধ্য নাই যে উহাদিগকে মুক্ত করিয়া দাও।

ভুবন। উহাদিগকে এখন কি করিবে?

সঙ্গী। বাঙ্গালায় পূরিয়া রাখিবে, রাত্রি প্রভাতে কাজী সাহেবের নিকট লইয়া যাইবে—কাজী সাহেবের বিচারে উহাদিগের যে দণ্ড হয়, তাহা ভোগ করিতে হইবে।

"হয় ত উহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোক আছে, আমি দেখিয়া আসি।" এই কথা বলিয়া ভুবন একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া তাহাদিগের নিকট ছুটিয়া গেলেন। শববাহক সঙ্গীগণ তাহাতে

বিরক্ত হইয়া বলিল, "ভাল! পাগলের সঙ্গে এসেছি, নিজের মায়ের শব থাকিল, ও গেল পরকে বিপদ মুক্ত করিতে।" কেহ কেহ বা ভুবনের উপর অন্য প্রকারে রাগ ঝালাইল, শেষে সেই স্থানে শব নামাইয়া সকলে বসিল এবং তামাকু সাজিয়া খাইতে লাগিল।

ভুবন গাড়ীর নিকটে পৌঁছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ী কোথাকার?"

গাড়োয়ান, ভদ্রলোক দেখিয়া অনেক পরিমাণে আশান্বিত হইল। বলিল, "আজ্ঞে রাজীবপুরের। মহাশয়, আমরা বিপদগ্রস্ত হইয়াছি।"

ভুবন। গাড়ীতে কাহারা?

গাড়ো। রাজীবপুরের প্রসন্নরায়ের কন্যা, আর তাঁহাদের বাড়ীর দাসী। যেতে যেতে রা'ত হ'য়ে পড়েছে। আমার আহাম্মুখী, আমি পথ ভুলে বাঙ্গালার সম্মুখে এসে পড়েছি—এখন ভদ্রলোকের মেয়ে নিয়ে কি করি তার উপায় নাই।

ভুবন পাইককে মুসলমান জানিয়া মিনতি করিয়া বলিলেন, "শেখ্‌জী! ভদ্রলোকের মেয়ে গাড়ীতে রহিয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।"

পাইক গোঁপে তা দিয়া লাঠি নাড়িয়া বলিল, "হাম্ নেহ ছোড়েগা উস্কো,—বদ্‌বখ্‌ত, বেতমিজ।"

ভুবন। এই গাড়োয়ান—বদ্‌বখ্‌ত—বেতমিজ যাই হউক্, গাড়ীর ভিতর ভদ্রলোকের মেয়ে আছে। শেখ্‌জী! তোমার মেয়ের সঙ্গে তুমি যদি না থাক, আর তাহার যদি পথিমধ্যে এইরূপ বিপদ হয়, তবে ভাবিয়া দেখ দেখি, কিরূপ

কষ্ট ও দুঃখের কথা ! অতএব দয়া করিয়া উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।

শেখজী। তোম্ কোন্ হো ? হম্ লোগোঁকে হুকুম হৈ পাকাড়ে নেকো উস্কো।

ভুবন। একটি টাকা তোমাকে দিতেছি, উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। আল্লা তোমার ভাল করিবেন।

শেখ্জী আরও ফুলিয়া উঠিল, "নেহি নেহি, হম্ ছোড়েগো নেহি।"

ভুবন। দু'টাকা !

শেখজী। নেহি, তোম্ ঘর্ যাও।

ভুবন। পাঁচ টাকা ?

শেখ্জীর মন ক্রমেই গরম হইতেছিল, সে তখন হিন্দিতে বক্তৃতা আরম্ভ করিল। সে দুর্ব্বোধ্য হিন্দিভাষা প্রকটন করিয়া পাঠককে আর বিরক্ত করিলাম না, তাহার বাংলা অনুবাদ করিয়া দিলাম। শেখ্জী বলিল, "ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতা আমার নাই, বাঙ্গালার ভিতর আমার মুনিব আছেন, সেইস্থানে চল, তাঁহার ইচ্ছা হয় ছাড়িয়া দিবেন, না হয় তাঁহার যা ইচ্ছা তাই করিবেন।"

ভুবন ভাবিলেন, চাষার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে, ভদ্রলোকের নিকট কাকুতি-মিনতি করিলে অবশ্য ছাড়িয়া দিবেন। বলিলেন, "চল।"

শেখজী। গাড়ী লইয়া যাইতে হইবে।

গাড়োয়ান গরু জুড়িয়া গাড়ী লইয়া চলিল। ভুবন ও শেখ্জী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। অতি অল্পকাল মধ্যেই গাড়ী বাঙ্গালার

নিকট পৌছিল। শেখ্জী বাঙ্গালার ভিতর প্রবেশ করিয়া "বাবু বাবু" করিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিল। রক্তিম-নয়নে স্থূলকায় বাবু উঠিয়া আসিল, বলিল, "কিরে ?"

শেখজী। এতরাত্রে একখানা গাড়ী বাঙ্গালার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছি। মবরকের যাহা খুসি হয়, তাহাই করুন।"

গাড়োয়ান তখন গাড়ীখানি বাঙ্গালার রকের নিকট রাখিয়াছে, ভুবন তাহার নিকট দাঁড়াইয়া আছে।

বাবু একবার গাড়ীখানির প্রতি চাহিলেন, বলিলেন, "গাড়ীতে কি ? গুড় বোঝাই নাকি ?"

শেখ্জী বুঝিল, বাবুর এখনও নেশার আমল যায় নাই। বাবু সমস্ত রাত্রি বন্ধু-বান্ধব লইয়া মদ খাইয়া এইমাত্র তাহাতে অবসর লাভ করিয়াছেন, বন্ধুগণও চলিয়া গিয়াছে।

শেখ্জী বলিল, "আজ্ঞে না, মেয়ে মানুষ।"

বাবু আহ্লাদে আটখানা হইলেন, বলিলেন, "মেয়ে মানুষ—মেয়ে মানুষ—বয়স কত ?"

উপযুক্ত ভৃত্য শেখ্জী বলিল, "বোধ হয় সতের আঠার—খুব সুশ্রী।"

বাবু নেশার ঘোরে সপ্তম-স্বর্গে উঠিয়াছেন! ভাবিলেন, "আমার জন্ম সার্থক।" তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া আনিতে নিজেই যাইতেছিলেন, কিন্তু নেশার ঝোঁকে তাহা পারিলেন না—কেদারার উপর বসিয়া পাইকের উপর হুকুম করিলেন, "লে আও—লে আও— তোম্‌কো "দশ রুপিয়া বখ্‌শিস্ মিলে গা!"

প্রভু-পরায়ণ ভৃত্য বাবুর আজ্ঞামাত্রেই ছুটিয়া যাইত, কিন্তু

পথে সে ভুবনের কথাবার্ত্তা শ্রদ্ধা ও ভাবভঙ্গি আদি দেখিয়া ভুবনকে নিতান্ত কাপুরুষ বা ভীরু ভাবে নাই। বিশেষতঃ অদ্য এ বাবুই সর্ব্বেসর্ব্বা নহেন। নবাব বাড়ী হইতে একজন প্রধান কর্ম্মচারী বাঙ্গালায় আসিয়াছেন। তিনি অপর একটা কক্ষে নিদ্রিত আছেন। কাজেই সাত পাঁচ ভাবিয়া পাইক ধীরে ধীরে গাড়ীর কাছে গেল, ধীরে ধীরে বলিল, "মেয়েটিকে উঠিয়া বাবুর নিকট যাইতে হইবে"

অন্যদিন হইলে শেখজী ধরিয়া লইয়া যাইত। কিম্বদন্তী আছে, মধ্যে মধ্যে তাহারা এরূপ পাশবক্রিয়া সম্পাদন করিত!

পাইকের নিকট ঐ কথা শুনিয়া গাড়োয়ানের তালু, জিহ্বা শুকাইল। দাসীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, মেয়েটি কাঁদিয়া উঠিল।

বাঙ্গালার নিকট আসিয়া বাবুর ভাব ভঙ্গী দেখিয়া এতক্ষণ ভাল করিয়া ভুবনের কথা ফুটে নাই, একটি কথা বলিতে গিয়া দশবার থামিয়া পড়িতেছিল; বাবুর পাশব-অত্যাচারে ও নির্দ্দয়বাক্যে হৃদয় ভেদ করিয়া রুদ্ধ উৎস ফুটিয়া বাহির হইল। চক্ষু আরক্তিম, মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সু-গুরু গম্ভীর স্বরে বলিল, "খবরদার! কটুবাক্য প্রয়োগ করিও না—ধর্ম্ম সহিবে না।"

বাবু রক হইতে সে কথা শুনিলেন, বাঁকাচোরা কর্কশস্বরে বলিলেন, "তুমি কে?"

ভুবন বিনীতস্বরে কহিলেন, আমি দীনহীন পথিক—আমার প্রতি কৃপা করিয়া এই গাড়ীখানি ছাড়িয়া দিন।"

বাবু। গাড়ী যাক, গাড়োয়ান্ যাক্, মেয়েমানুষটিকে আমায়

দিয়া যাও—ও স্বর্গের হুরী, আমার হৃদয়বিহারিণী। ও আমার সঙ্গে মদ খাবে।

ভুবনের চক্ষু প্রদীপ্ত—মুখমণ্ডল আরক্তিম—আপাদমস্তক ঈষৎ কম্পমান! যেন একটা রুদ্ধ-প্রবাহ মহাবেগে তাঁহার সর্ব্ব-শরীর তরঙ্গীত করিতেছে। তিনি বলিলেন, "মহাশয়! আপনি ওরূপ কথা আর প্রয়োগ করিবেন না, আপনার ভাল হইবে না।"

বাবু। ও তোমার কে? তোমার স্ত্রী?

ভুবন। না, আমার মা।

বাবু। বদ্‌জাত, তোর বয়স ২৫ বৎসর, আর তোর মা'র বয়স ১৭ বৎসর! তবে আমি তোর বাপ।

ভুবনের মাথা ঘুরিয়া গেল, কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গাড়োয়ানকে কহিলেন, "উঠাও গাড়ী।"

বাবু কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, "খবরদার বদ্‌মাস্, কাটিয়া ফেলিব।"

একজন বৃদ্ধ পাইক সেই রকে শুইয়াছিল, সে শুইয়া-শুইয়া সমস্ত শুনিল। এরূপ ব্যাপার প্রায় সে প্রত্যহই দেখিয়া থাকে, কিন্তু আজ গতিক বড় ভাল নয় ভাবিয়া এবং আর একজন কর্ত্তৃপক্ষ এখানে আছেন বলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বড়বাবুর নিকটে গেল। তাঁহাকে ডাকিয়া সমস্ত নিবেদন করিল। তিনি আসিয়া রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। জ্যোৎস্নালোকে ভুবনকে দেখিয়া বলিলেন, "কি ভুবন বাবু যে, ভাল আছেন?"

শুষ্কফুলে শিশির পড়িল। ভুবনের নিপীড়িত-হৃদয়ে আশার

সঞ্চার হইল! বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে একরূপ ভাল আছি।"

বাবুটী যদুনাথ রায়ের আত্মীয় এবং নবাব বাড়ীর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। কার্য্যব্যপদেশে কোথায় গিয়াছিলেন, অধিক রাত্রি হওয়ায় বাঙ্গালায় রহিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ভুবনের সহিত পরিচয় ছিল। বাবু বলিলেন, "ভুবন, উপরে এস।" তিনি একখান চৌকিতে বসিয়া আছেন, ভুবনকেও তাহার উপর বসিতে বলিলেন। ভুবন বলিলেন, "আমি চৌকিতে বসিব না, আমার অশৌচ। আজ মা'র মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার শব লইয়া শ্মশানে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে ইহাদিগকে বিপদাক্রান্ত দেখিয়া আসিয়াছি। হুজুরের হুকুম হইলে উহারা চলিয়া যায়।"

বাবু। তোমার মায়ের মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। উহারা চলিয়া যাউক, বাধা নাই।

ভুবন আহ্লাদিত চিত্তে গাড়োয়ানকে বলিলেন, "তোমরা যাও—আর কোন বাধা নাই।"

গাড়োয়ান গরু জুড়িতে যাইতেছিল, যুবতী বলিল, "ক্ষণেক অপেক্ষা কর, উনি আসুন।"

ভুবন বাবুটির নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "আমি তবে এখন যাই, পথে মা'র শব ও লোকজন রহিয়াছে।"

বাবু। হাঁ, যাও। অর্থের অভাব আছে কি?

ভুবন। আজ্ঞে না, শ্রাদ্ধের সময় অনাটন হইতে পারে।

"আমাকে পত্র লিখিও, আমি কিছু পাঠাইয়া দিব।" এই বলিয়া বাবু একজন পাইককে শ্মশান পর্য্যন্ত ভুবনের সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। সে ভারটা পূর্ব্ব-পাইকের উপরই পড়িল।

সে ভাবিল, ভাল বিপদ্, সেই সময় যদি পাঁচটা টাকা লইয়া ছাড়িয়া দিতাম, তবে ভাল হইত। সবই গেল, লাভের-মধ্যে এখন মড়ার সঙ্গে শ্মশানে যাইতে হইল। ভুবন বলিলেন, "পাইককে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে না, গাড়ীর সঙ্গে থাক।"

বাবু। গাড়ীতে তোমার কে ?

ভুবন। আমার স্ব-সম্পর্কীয় কেহ নহে। তবে বিপন্ন আমার পরমাত্মীয়।

বাবু। ভুবন, তুমিই যথার্থ মানুষ।

ভু। আমি দুঃখী। অর্থাভাবে দুঃখী নহি, পরের কষ্ট লাঘব করিতে পারি না, পরের চোকের জল মুছাইতে পারি না, এই দুঃখেই দুঃখী। এখন বিদায় হইলাম।

ভুবন রক হইতে নামিয়া গাড়োয়ানকে কহিলেন, "এই পাইককে সঙ্গে করিয়া তোমরা যাও, আমিও চলিলাম। গাড়োয়ান "যে আজ্ঞা' বলিয়া গাড়ী জুড়িয়া দিল। পাইক ও ভুবন সঙ্গে চলিলেন। ক্ষণিক যাইয়া ভুবন বলিলেন, "আমি এই পথে গেলাম, তোমরা যাও।"

গাড়ীর মধ্য হইতে যুবতী বলিল, "গাড়ী রাখ।" গাড়োয়ান গাড়ি রাখিল। যুবতী গাড়ীর পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসিল, ভুবনকে বলিল, "দেব, আপনার প্রকৃত পরিচয় বলুন, আপনি কে ?"

ভুবন। আমি দীনহীন গরীব ব্রাহ্মণ।

যুবতী। আপনি নরবেশে স্বর্গের দেবতা—আমার গুরু, আপনার নাম কি ?

ভুবন। ভুবনমোহন।

যুবতী। উপযুক্ত নাম বটে! দেব! এরূপ কামনা-রহিত হইয়া পরোপকার করিতে কোথায় শিখিয়াছেন? আপনি আমার গুরু। আমাকে উহা শিখাইবেন? আমিও ব্রত শিখিবার অধিকারিণী, আমি বিধবা।

"ভেদাভেদ জ্ঞান বিরহিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করা ভিন্ন অন্য ভাব হৃদয় হইতে উন্মুলিত করাই মানুষের ধর্ম্ম। উহা শিখাইতে হয় না—শিখিতে হয়।" এই বলিয়া ভুবন চলিয়া গেলেন। গাড়োয়ান গাড়ী জুড়িয়া চলিল—পাইক সঙ্গে গেল।

ভুবন সঙ্গীগণসহ মিলিত হইলেন। তাহারা ভুবনের উপর অনেক ধমক দিল, রাগও প্রকাশ করিল। ভুবন তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, অন্যের একটু উপকার করিতে পারিয়াছেন, এই তাঁহার মনে অপার আনন্দ। সে আনন্দের নিকট মাতৃশোক, সঙ্গীগণের তিরস্কার সকলি ভাসিয়া গেল। পরে শব লইয়া শ্মশানে গমন করিলেন। সেখানে যথাশাস্ত্র মাতার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করণান্তর দোকানে যাইবেন, এমন সময় সেই মৃতপুত্র-শোক-মুহ্যমানা রমণীকে দেখিয়া চাহিয়া রহিলেন।

সঙ্গীগণ ডাকিল। ভুবন বলিল, "দোকানে যাইয়া আপনারা আহারাদি করুন, আমি একটু পরে আসিতেছি।"

সঙ্গীগণ বড় রাগিল—বলিল, "তোমার মাকে গঙ্গায় দিতে এসে খাবার পয়সা ত' আমরা বাড়ী হ'তে আনিনি!" ভুবন অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "টাকা আমি দিতেছি, কত লাগিবে বলুন।" সঙ্গীগণ বলিল, "দশ টাকার কমে হইবে না।" ভুবন অমনি দশটি টাকা তাহাদিগের হাতে দিলেন—তাহারা চলিয়া গেল।

ভুবনের কারুণ্যময় প্রাণে রমণীর সে শোকপ্রবাহ বড়ই বাজিতে লাগিল, সে আর সহ্য করিতে পারিল না। পুত্রশোকাতুরা, রোরুদ্যমানা, আলুলায়িত-কেশা ধূল্যবলুণ্ঠিত রমণীর হাত ধরিয়া তুলিলেন। অনেক প্রকার প্রবোধ দিলেন, শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা! এতরাত্রে এই ভীষণ শশ্মানে পুত্রশোকানল বুকে করিয়া পুত্রের শব ফেলিতে তুমি একা আসিয়াছ; তোমার কি আর কেহ নাই?"

রমণী আরও কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "ওগো! আমার আর কেহ নাই, আমার এ জগতে কেবল ঐ ছেলেটি ছিল, আমি এই গ্রামের মুখুয্যে বাড়ীর দাসীপণা করিয়া উহাকে মানুষ করিতেছিলাম। ওলাউঠা রোগে পুত্রটির মৃত্যু হইল, সংক্রামক রোগ বলিয়া আর দুঃখিনীর সন্তান বলিয়া উহাকে ফেলিতে কেহই এলনা গো! এখন আমি কি করি—কেমন করিয়া কি করিতে হয়, তা'ত আমি জানি না!"

ভুবন কোঁচার কাপড়ে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিলেন, "তুমি স্থির হও, যাহা করিতে হয় আমি করিতেছি।"

ভুবন শবের সৎকার করিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। রমণী চীৎকার করিয়া লুটিয়া-লুটিয়া কাঁদিতে লাগিল। ভুবন তাহার হস্ত ধরিয়া তুলিয়া বিবিধ প্রকার সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা বুঝাইতে লাগিলেন। শেষে স্নান করাইয়া বলিলেন, "তুমি যে বাড়ীতে থাক, তাহা এখান হইতে কত দূর?"

রমণী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "অধিক দূর নহে।"

ভুবন। তবে চল, আমি তোমায় সেখানে রাখিয়া আসি।

রমণী আর কোন কথা কহিল না—কাঁদিতে লাগিল। ভুবন তাহার হস্ত ধরিয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন। গ্রামের মধ্যে যাইয়া ভুবন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে বাড়ীতে থাক, তাহা কোন দিকে ?"

সে বাড়ী নিকটে হওয়ায় রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, ভুবন ফিরিয়া আসিল। তখনও রাত্রি আছে। তখনও জোৎস্নায় পৃথিবী ফুট্-ফুট্ করিতেছে। তবে রাত্রিটা প্রায় শেষ হইয়া পড়িয়াছে, সু-মৃদু শীতল-সমীর বহিতেছে, ফুটন্ত ফুল-রাশির গন্ধ চারিদিকে বহিতেছে। ভুবন আপন মনে, উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে আবার নদীতীর দিকে আসিতেছেন ; এমন সময় দেখেন, এক বিকটাকার বিস্তারবিহীন দৈর্ঘের মূর্ত্তি। ভুবন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সে মূর্ত্তির পানে চাহিয়া থাকিলেন, ক্রমেই সে মূর্ত্তি নিকটে আসিল। দেখিলেন, এক জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালবিশিষ্ট পুরুষ। ভুবন বলিলেন, "তুমি কে ?"

পুরুষ। বাবা, তোমার জয় হউক, আমি ভিক্ষুক, আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও।

ভুবন। এত রাত্রে ভিক্ষুক ?

পুরুষ। বাবা, আজ তিন দিন-রাত্রি ভাত খাই নাই। গ্রামে মারি ভয়, কেহ ভিক্ষা দেয় না, আমারও ব্যায়রাম হইয়াছিল, তাই এত কৃশ হইয়া গিয়াছি। ঘরে ছেলে পুলে না খেতে পেয়ে মারা গেল। তাই রাত্রি থাকিতে উঠে গ্রামান্তরে যাইতেছি, সকালে না পৌছিলে ভিক্ষা পাওয়া যায় না।

ভুবনের নিকট তখন আর একটি মাত্র টাকা ছিল, তাহা

তাহাকে দিলেন। সে 'জয়-জয়কার হউক' বলিয়া ফিরিয়া বাড়ী গেল। ভুবন অপার আনন্দ লাভ করিলেন।

ভুবনের হৃদয় বিমল করুণায় পূর্ণ, নিঃস্বার্থ প্রেমের আধার। ভালবাসা ছড়াইয়া, করুণা বিলাইয়া তাঁহার সে করুণার, সে প্রেমের আর ক্ষয় না; দ্রৌপদীর বস্ত্রের মত তিনি যত প্রেম ঢালেন, ততই তাহা আরও বেগে উথলিয়া উঠে, আকাশের, মহাসমুদ্রের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে প্রেম-ভাণ্ডার যেন অক্ষয়—অনন্ত! দান করিয়া বিতরণ করিয়া তাহা ফুরান যায় না। এ পর্য্যন্ত ভাল-বাসিয়া অন্যের কষ্ট দূর করিয়া তাঁহার আশা মিটে নাই। তাঁহার ইচ্ছা—অন্যের সমস্ত দুঃখ মুছাইয়া ফেলেন, কিন্তু যখন দেখেন, তাহাতে তিনি অক্ষম—তিনি জীবন দিলেও তাহাকে পূর্ণ সুখী করিতে পারিবেন না, তিনি ত' অতি তুচ্ছ, কত শত পুণ্যাত্মা মহাত্মা, অকাতরে আত্মদান করিয়াও মানুষের পূর্ণসুখ ফিরাইতে পারেন নাই—তখনই ভুবনের যেন শান্তি চলিয়া যায়। অন্যের দুঃখে তিনি এত আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন যে, সে সমুদ্রে নিজের সুখ দুঃখ একটি জলবিম্বের মত মিলাইয়া যায়।

(৮)

শ্বেত, নীল, নির্ম্মল মেঘের উপর অস্তগমনোন্মুখ চাঁদের আধখানি মুখ সুধু ফুটিতেছে—তবু রূপ ধরে না। লজ্জাবতী যুবতীর মত আধ-ঘোমটার ভিতর হইতে সে রূপ উছলিয়া পড়িতেছে। সেই অস্ফুট-রূপজ্যোতিতে শ্যামক্ষেত্র, প্রান্তর প্লাবিত

হইয়াছে, দিগন্তর-সীমা হারাইয়া গিয়া আকাশ পৃথিবী এক হইয়া গিয়াছে, সসীম—অসীমে গিয়া মিশিয়াছে, ভাবের সৌন্দর্য্যে বিশ্ব ডুবিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যে দিকে জ্যোৎস্নার এত রূপের ছড়াছড়ি, প্রাণঢালা হাসির উচ্ছ্বাস, সে দিকে ভুবনের দৃষ্টি নাই। তাঁহার দৃষ্টি অন্য দিকে, তাঁহার দৃষ্টি নদীর উপর। এখানে আর জ্যোৎস্নার পূর্ণ বিকশিত সৌন্দর্য্য ঘটে নাই, উভয় তীরের বৃক্ষাবলীর ছায়া পড়িয়া দুই দিক হইতে নদীর জ্যোৎস্নালোক এখানে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এখানে আলোক অন্ধকারে মিশিয়া নদীর জলে গ্রহণ লাগিয়াছে, ছায়া আলোকের অপূর্ব্ব মিলন চলিয়াছে—তাহা দেখিতে দেখিতে ভুবনের মনে হইতেছে—

"এ পৃথিবীতে সকল বিষয়েই সারা দিন নাই। বুঝি এইরূপ আলোক-অন্ধকারে গ্রহণ লাগে। যেখানে আলোক, সেইখানেই বুঝি অন্ধকার। যেখানে সুখ, সেইখানেই বুঝি দুঃখ জড়িত। একটি চাহিলে আর একটিকে বুঝি সঙ্গে সঙ্গেই ধরিতেই হইবে। নদীর এই উপকূল—সারাদিন বুকে আঁধার ধরিয়া আছে, একটু আলোক পাইবার জন্য কতই না উহার আকুল বাসনা! কিন্তু এত চাহে বলিয়াই বুঝি আলোক উহার দিকে ফিরিয়া চাহিতে পারে না। অযাচিতভাবে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করিয়া এই দীনহীন ক্ষুদ্র উপকূলকে ভিক্ষা দিতে গেলেই বুঝি উহার ধনভাণ্ডার ফুরাইয়া যায়—আলোকের আলোকত্ব লোপ পাইয়া যায়। যে আলোক ছিল, সে ছায়া হইয়া পড়ে। উপকূলের অন্ধকার ঘুচাইবে কি, সে অন্ধকার আরও গভীর করিয়া তুলে। এই বুঝি প্রকৃতির নিয়ম।—আলোক চাহিলেই আঁধার আসে! সুখ চাহিলেই দুঃখ আসে!"

জ্যোৎস্না-ধৌত নিশীথের স্বপ্নের মত বিভাষিত, সে ঘুমন্ত প্রবাহিত স্রোতস্বিনীর পানে চাহিয়া ভুবন বুঝিতে পারিলেন, যেখানে আলোক-আঁধার এক হইয়া গিয়াছে, যেখানে সুখ দুঃখ সব সমান, যেখানে সুখে আকাঙ্ক্ষা নাই, দুঃখে বিরাগ নাই, সেইখানেই শান্তি বিরাজমান। এই আলোক-আঁধারের স্বাতন্ত্র্যহীনতাই প্রকৃত স্থায়ী আলোক, সুখ-দুঃখের সাম্যভাবই প্রকৃত সুখ, তা'ছাড়া আর সংসারে সুখ নাই।

সহসা ভুবনের চিন্তাভঙ্গ হইল, সেই নির্জ্জন অপরিচিত তটিনীতটে অর্দ্ধস্ফুট-চন্দ্রের মলিন জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, দুইটি বেগবান অশ্বে দুইজন সৈনিক নৈশগম্ভীরতা ভঙ্গ করিয়া

"ঘুমাসনে ঘুমাসনে আর,
দেখ্‌রে কে লয়ে গেল প্রতিমা সোণার।
নিশীথে নিদ্রার কোলে, ছিলি শুয়ে সবে ভুলে,
পেলিনে দেখিতে চুরি স্বর্ণ-প্রতিমার,
দেখ্‌রে নয়ন মেলি, দেখ্ একবার।"

গাহিতে-গাহিতে নিমেষ মধ্যে চলিয়া গেল। সেই গানের প্রজ্জ্বলিত তরলতার মধ্য হইতে শোকের—উদ্যমের নিরবগুণ্ঠিত ভাবরাশি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—ভুবন বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

এই সময় একজন সন্ন্যাসী ভুবনের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বেশ-ভূষা সাধারণ সন্ন্যাসীর মত নহে! সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার দেহ অনাবরিত নহে, এক শিথিল অঙ্গাবরণে গলদেশ

হইতে পাদ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত,—গলে রুদ্রাক্ষ বা অন্য কিছুরই মালা নাই, মুখমণ্ডল ভস্ম কিম্বা চন্দন-চর্চ্চিত নহে; পৃষ্ঠলম্বিত কেশ-জটা ও আবক্ষবিস্তৃত শ্মশ্রুরাশি মাত্র। তাঁহার শুভ্রবর্ণ—অসামান্য জ্যোতিসম্পন্ন প্রশান্ত গম্ভীর সহাস্য মুখের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। ভুবন চমকিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। নীহারমণ্ডিত মহান্ পর্ব্বতশিখরে চন্দ্রকিরণের ন্যায় ঈষৎ মৃদুহাস্যে আপনার বিমল প্রশান্ত মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "সেই বীর—যে দুর্ব্বলের রক্ষক, সেই পুরুষ—যে অসহায়ের সহায়, সেই মহাত্মা—যে অত্যাচার-নিবারক, তাহার আর সন্দেহ নাই। আইস, আমরা আলিঙ্গন করি, আজি হইতে তুমি আমার শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইলে। সন্ন্যাসী স্নেহভরে ভুবনকে আলিঙ্গন করিলেন। সে স্পর্শ কি পবিত্র, কি সুখজনক, তাহাতে যেন ভুবনের মোহ হঠাৎ দূরে গেল, দিব্যচক্ষু খুলিয়া দিল—কি এক দিব্যস্মৃতি মনের মধ্যে হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। যেন এই মহাপুরুষের পবিত্রমূর্ত্তি তিনি আজীবন দেখিয়া আসিতেছেন; কতবার নিস্তব্ধ গভীর রজনীতে, দুঃখতাপে জর-জর হইয়া যখন চারিদিক শূন্য দেখিয়াছেন, তখন ঐ মহাপুরুষ অমৃতময় বাক্যে যেন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, কতবার—যখন মোহের ছলনায় অশান্তির তরঙ্গময় স্রোতে পড়িয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তখন যেন ঐ দিব্যমূর্ত্তি দেখা দিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়াছেন, জাগ্রতে স্বপনে, সুখে দুঃখে ঐ এক মূর্ত্তি—ঐ এক দিব্য ছবি কতবার—কতবার যেন তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইয়াছে!

সন্ন্যাসী তেমনি সহাস্যমুখে বলিলেন, "ভুবন! তোমাকে

উপযুক্ত জানিয়া শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করিলাম, তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই লও।"

ভুবন অভিবাদনপূর্ব্বক বিনীতবচনে বলিলেন, "দেব, যখন বর লইতে অনুমতি পাইয়াছি, তখন লইব। অন্য কিছু আমি চাহি না, আমাকে এই বর দিন—আমার জ্ঞান হইয়া এই এক আকাঙ্ক্ষা আমার প্রাণের মধ্যে জাগিয়া আছে। অন্যের কষ্ট দেখিলে যখন আকুলহৃদয়ে তাহা উপশম করিতে ব্যাগ্র হই—কেন প্রভু, তাহাতে সাফল্য হইতে পারি না? আমি আর কিছু চাহি না। আমাকে এই বর দিন, যেন অপরের কষ্ট লাঘব করিতে আমি সক্ষম হই।"

রোমাঞ্চিত শরীরে সন্ন্যাসী প্রাণ ভরিয়া ভুবনকে আর একবার আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তোমার প্রেমের অনন্তধারে পাপী তাপী সুশীতল হইবে। কিন্তু একেবারেই কোন কর্ম্মে সুসিদ্ধ হওয়া যায় না। আত্মপর অবিচ্ছেদ করিয়া ভালবাসিতে আরম্ভ কর, ক্রমেই এই ভালবাসার পরিমাণ বাড়াইতে থাক, ক্রমে যখন অভ্যাসে-অভ্যাসে বিনা চেষ্টায় এই ভালবাসা অবারিত বেগে অহর্নিশ স্বতঃ উৎসারিত হইবে, যখন এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অনন্ত প্রেমকে ধরিতে পারিবে—যখন ভালবাসায় বিন্দুমাত্রও স্বার্থ থাকিবেনা, তখনই সুসিদ্ধ হইবে—এখন নহে। যাও বৎস, গৃহে গিয়া ইহার সাধনা কর।"

আনন্দের উচ্ছ্বাসে ভুবনের হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি এত আনন্দ বুঝি কখনও অনুভব করেন নাই। ভুবন কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "আপনার আশ্রম কোথায়?"

সন্ন্যাসী। আমার আশ্রমের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থান নাই। আমি সর্ব্বত্রই থাকি।

ভুবন। কোথায় দেখা পাইব?

সন্ন্যাসী। যদি প্রয়োজন হয়, দেখা পাইবে।

"একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। আপনার আসিবার মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে যে দু'টি অশ্বারোহী সৈনিক কি একটি গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল, উহারা কে? এই বলিয়া ভুবন সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "সে গান আমি শুনিয়াছি, সে প্রাণভেদী গান তুমি শুনিয়াছ?"

ভুবন। শুনিয়াছি, কিন্তু সকল বুঝিতে পারি নাই, এইটুকু আমার মনে আছে,—

"নিশীথে নিদ্রার কোলে, ছিলি শুয়ে সব ভুলে,
খেলিলে দেখিতে চুরি স্বর্ণ প্রতিমার!

সন্ন্যাসী অতি স্থির কটাক্ষে ভুবনের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "যেটুকু শুনিয়াছ, মনে আছে—ঐ টুকুই উহার প্রকৃত কথা। সৈনিকদ্বয়কে তুমি জান। একজন জমিদার যদু বাবুর ভ্রাতা সতীশচন্দ্র, অপর সরোজা। এক্ষণে আমি চলিলাম।"

দেখিতে দেখিতে একখানি ছায়ার মত সন্ন্যাসীর সে দেবমূর্ত্তি দিগন্তের কোলে যেন মিলাইয়া গেল।

পাঠককে জানান উচিত যে, বনদেবী হরণ ও ভুবনের এই সকল কার্য্য এক রাত্রেরই কথা।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে ভুবন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এ কি! এ কোন্ দেবতা আমায় কিরূপে ছলনা করিয়া গেলেন! সতীশচন্দ্র ও সরোজা সৈনিকবেশে কোথায় চলিয়াছে!

কি গান গাহিল!—"নিশীথে নিদ্রার কোলে, ছিলি শুয়ে সব ভুলে, পেলিনে দেখিতে চুরি স্বর্ণ প্রতিমার।" কে চুরি করিল? কি চুরি করিল? ভাবিতে ভাবিতে সেখানে বসিয়া পড়িলেন, আত্মবিস্মৃতির ঘোরে পড়িয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

---

(৯)

রজনী ভোর হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে পাখী সকল কলরব করিতেছে—পূর্ব্বাকাশে তরুণ অরুণ-কিরণ ঝকমক করিতেছে। ভুবনমোহন এখনও সেইভাবে সেই ঘাটের ধারে বসিয়া আছেন, নিশার শিশির তাঁহার মস্তকের উপর, গাত্রের উপর পড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তাগুলির মত দেখাইতেছে। পাখীর কলরবে, মানুষের কোলাহলে, সূর্য্যের কিরণে একবার তাঁহার চমক হইল, চক্ষু উন্মিলীত করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, ভোর হইয়া গিয়াছে। গ্রামের কুলাঙ্গনাগণ ঘাটে স্নান করিতে আসিতেছে, স্নান করিতেছে, বহুবিধ গল্পের অবতারণা সমালোচনা ও উপসংহার করিতেছে। ভুবন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অস্ফুটভাবে বলিলেন, "নিশীথে নিদ্রার কোলে, ছিলি শুয়ে সব ভুলে, পেলিনে দেখিতে চুরি স্বর্ণ প্রতিমার।" কে চুরি করিল? কাহাকে চুরি করিল? স্বর্ণ প্রতিমা—কে? তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, প্রাণের ভিতর আঁধার হইয়া উঠিল—মৃদুস্বরে বলিলেন, "সতীশচন্দ্র সৈনিকবেশে। তিনি বীরপুরুষ, জমিদারের ভাই, আবশ্যকমর্তে যুদ্ধের জন্য সৈনিক হইয়াছিল। সরোজা—কুল-ললনা। সে কেন?—ছদ্মবেশে কেন

সে সৈনিক সাজিয়াছে ? সে কেন গাহিল, "পেলিনে দেখিতে চুরি স্বর্ণ প্রতিমার।" এ প্রতিমা কি ? এ চোর কে ? বোধ হয়, এ চোর স্বয়ং কাজী সাহেব, এ স্বর্ণ প্রতিমা—বনদেবী। কিন্তু চুরি করিবে কেন! যদুনাথ স্বয়ংই ত' কন্যাদান করিতে সম্মত আছেন। যদিই কোন উদ্দেশ্য থাকে, যদিই বনদেবীকে চুরি করিয়া থাকে, তবে কি হইবে ? বনদেবী ত' নবাবকে বিবাহ করিতে, হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিবে না, তবে কি হইবে ? তাহার কি উদ্ধার হইবে না ? কে উদ্ধার করিবে ?

মনে হইল, কে রক্ষপুর হইতে সীতাসতীর উদ্ধার করিয়াছিল ? কে জয়দ্রথের হস্ত হইতে দ্রৌপদীকে নিস্কৃতি দিয়াছিল ? কেন রাবণকুল ধ্বংস হইল ? কেন দুর্য্যোধন সবংশে মজিল ?

ভুবন যে দিকে মনশ্চক্ষু ফিরান, সেইদিকেই দেখিতে পান, অনন্ত যাতনার বিকটছায়া! দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, বলহীনা রমণীর প্রতি বল প্রয়োগ—ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত।

দ্যুলোক—ভূলোক—বিশ্বলোক মনে পড়িল। মধুমুর, নরক, ত্রিপুর, মহিষাসুর, মধুকৈটভ, কালকেয়, দুর্গা, বক, হিড়ম্বক মনে পড়িল। তাহাদিগকে কে মারিল ? তাহারা কেন মরিল ? কেনই বা হইল, কেনই বা মরিল!

শেষে মনে স্থির হইল, তাহাদিগকে দেবতা ধ্বংস করিয়াছেন, —দেবতা অর্থে ধর্ম্ম।*

---

* দেবদেবীর একটা সাধারণ অর্থ আমি এই বুঝি যে, কর্ম্মফলপ্রদ শক্তির দেবদেবী। একজন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন,—Every thought of man upon being evolved passes in the inner world and there coalese ing with an elimental becomes an active entity এই active

তখন ভুবনের মনমধ্যে কুলালচক্রের ন্যায় কি একটা ঘুরিয়া উঠিল। তাহাতে মস্তক ঘুরিল, দেহ ঘুরিল, প্রাণ মন সবই ঘুরিয়া গেল। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মুদ্রিত নয়নের অন্ধকাররাশির মধ্যে ভুবন দেখিলেন—স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে—

ধর্ম্মবিস্তার

আর

একতা।

বুঝিলেন, ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিতে সকল অন্ধকার মোচন করিবে।

ভুবন ইহা বুঝিবামাত্র মোহাবৃত পাগলের ন্যায় হইলেন। এ আলোক, এ স্বর্গীয় আলোকে কে কবে স্থির থাকিতে পারিয়াছে? এ আলোকে ভুবন বাহ্বাস্ফোটন করিয়া বলিলেন, "এই বাহু! ইহাতে কি জোর নাই? ইহা কি কেবল ভোজনগ্রাস তুলিবার জন্য বহিয়া বেড়াই? কাহার মুষ্টির তরবারি এত দৃঢ়? কে বন্দুকে এমন লক্ষ্য করিতে পারে? কে এমন উদ্দীপনা-রাগিণীর সুমধুর ঝঙ্কারে জগত মাতাইতে পারে? আমার কি শরীরে সামর্থ নাই? আমি কি রণকৌশল জানি না?"

সহসা যেন ভুবনের মস্তকোপরি শত শত অশনি নিপতিত হইল। আশা, ভরসা, উদ্যম—সকল যেন অনন্ত সমুদ্রের অনন্ত

---

entityরাই দেবদেবী। শক্তি দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে, দৃষ্টশক্তি এবং অদৃষ্টশক্তি। অদৃষ্টশক্তিই দেবশক্তি। Forces in the astral Light—অর্থাৎ সূক্ষ্মজাতীয় শক্তিরই নাম দেবতা।

বারি রাশিতে বিলীন প্রাপ্ত হইল। চক্ষু দিয়া প্রবল বেগে জল বাহির হইল, হৃদয় মাঝারে সে আলোক যেন একখানি গাঢ় কালিমাময় মেঘে ঢাকিয়া ফেলিল, বলিলেন, 'আমি এ কি ভাবিতেছি, আমি ত ক্ষুদ্র, আমি ত এ সংসার-সমুদ্রের একটু বালুকাকণা, আমার এত দর্প—ধিক্!' আরও বলিলেন, "আমি এইমাত্র না গুরুর নিকট নিষ্কাম ধর্ম্মের শিক্ষা লইলাম? আমি না জগৎ সংসারকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম?—ধিক্।"

ভুবন আবার জানুদ্বয় মধ্যে মস্তক রাখিয়া একাগ্রমনে পরমেশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিলেন। অনন্ত, অব্যয়, নির্গুণ, নিখিলাধার, জগদ্বীজ, সর্ব্বকার্য্যের ফলদাতা, সর্ব্বাদৃষ্টের নিয়ন্তা যে, তাহার শুদ্ধ জ্যোতি, অনন্ত প্রকৃতি ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ঘাটে তখন অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া জুটিয়াছে। সকলে ভুবনকে দেখিয়া নানারূপ কথা কহিতেছে। কেহ বলিতেছে, "ওলো, ঐ দেখ, একটি সুন্দর ছেলে বসে কাঁদিতেছে।"

২য় রমণী। না ভাই, ও পাগল!

৩য় রমণী। তাই ত, ওর বুঝি কে মরেছে।

৪র্থ রমণী। ঠিক্ কথা, ও সেদিন আমাদের বাড়ীর নিকট দিয়া কতকগুলা ছেঁড়া নেকড়া, গোটা গাছের ডাল হাতে করে নাস্তে নাস্তে যাচ্ছিল।

৫ম রমণী। হাঁ, হাঁ, ও ভারি পাগল, ঐ দেখ্ চুপ ক'রে ব'সে আছে, হয়ত এখনি উঠে ঢিল মেরে দেবে এখন। ও লোককে মড় মারে। ওকে দেখ্‌লে ভাই আমার বড় ভয় করে।

৬ষ্ঠ রমণী। হাঁ, সেদিন রায়েদের ছেলেকে বড় মেরেছিল ব'লে রায়ঠাকুর যে ওকে মেরেছিল ভাই, ভাব্‌তেও কষ্ট হয়।

৭ম রমণী। না, ও কাকেও মারে না। খাসা গান গায়। দেখ্‌বি, ডাক্‌ব ?

রমণীগণ স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন, ভুবন পাগল এবং তাঁহারা যে ভুবনকে বিশেষরূপে চেনেন, সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ থাকিল না। যখন সপ্তমা বলিলেন, "ও কাহাকেও মারে না, ও বেশ গান গাইতে জানে, উহাকে ডাক্‌ব ?" সেই সময় ঘাটে একটি সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী এক দাসী সমভিব্যাহারে আসিল। তাহাকে দেখিয়া সপ্তমা বলিলেন, "কি বিরাজ, কবে এলি, ভাল ছিলি ত ? পাগল দেখ্‌বি ? ঐ দেখ্, ও বেশ গান গাইতে জানে, শুন্‌বি ? ওকে ডাকব ?"

যুবতী ভুবনের দিকে চাহিল। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, বলিল, "ডাক দেখি ?"

সপ্তমা রমণী গর্ব্বিতভাবে ডাকিলেন, "ও গদাধর, একটা গান গা'না, তোকে একটা পয়সা দিব।"

কে উত্তর দিবে ?

ষষ্ঠা রমণী তখন সপ্তমাকে বলিলেন, "এই বুঝি তুই ওকে চিনিস ? ওর নাম না রামচরণ, আমি ওকে খুব চিনি, ডাকিব—ও রামচরণ ?"

কে রামচরণ ! কে কথা কহিবে ?

পঞ্চমা বলিল, "তুইও চিনিস্ না। আমি ওকে চিনি, তবে ডাকিতে ভয় হয়—ও বড় মারে।"

চতুর্থা বলিল, "ওর নামটা কি আমার মনে নাই, বলে দাও, আমি ডাক্‌ছি।"

পঞ্চমা একটু হাসিয়া বলিলেন, "ওরে আর চিনিস্ না,

সেদিন আমাদের বাড়ীতে ভাত খেয়ে গেল; ওর নাম বুনো।”

চতুর্থী বড় বিপদে পড়িল, বুনো ত' নাম বলিল, এখন সে তাকে কি বলে। বুনো কথাটা ত ভাল নহে, কি জানি পাগল মানুষ শেষে রাগ করিবে। বিশেষতঃ পঞ্চমা, উহার প্রহার ক্ষমতা বিষয়ে যেরূপ অকাট্য প্রমাণ দিতেছেন, তাহাতে তাহার প্রহার শক্তির বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বুনোর একটা ভাল শব্দ গড়িয়া লইল, “বন!”

রমণীগণের কোলাহলে ভুবনের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিনি আর ভাবেন নাই যে, রমণীগণ তাঁহাকেই পাগল বলিয়া অভিহিত করিতেছে। অথবা সে কথায় তিনি আদৌ মনসংযোগ করেন নাই। তবে সে কথার কতক কতক ভগ্নাংশ-রূপে তাঁহার কর্ণে পৌঁছিতেছিল, কিন্তু তিনি তখনও চিন্তামগ্ন। তাঁহার প্রাণের মধ্যে কত শত চিন্তা কিলিবিলি করিতেছিল, তাঁহার জীবন শাসিত হইতেছিল। আমাদের সকলেরই এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত জীবন শাসিত হয়। ভুবনের তাহাই হইতেছিল। ভুবন যে কোথায় বসিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন, তাহা তাহার ভাবিবার ক্ষমতা তখন ছিল না। যতক্ষণ তিনি জগদীশ্বরের শান্তরূপ ভাবিতেছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে শান্তি ছিল, লোক-কোলাহলে যেই মাত্র সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়াছেন, সেই মাত্রই স্মৃতিরূপ শত শত বৃশ্চিক আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে দংশন করিতে আরম্ভ করিল। সেই বনদেবীর মুখখানি, সেই অনন্ত প্রেম, সেই হৃদয়ঢালা নিঃস্বার্থ

ভালবাসা, সেই দগ্ধ-হৃদয়ের শেষ বিদায়—এমন সময় রমণী ডাকিল, "বন!" বনদেবীকে কেহ কেহ "বন" বলিয়া ডাকিত। তিনি কি ভাবিয়া—বুঝি আমার বনদেবী আসিয়াছে ভাবিয়া চাহিয়া দেখিলেন। সেটা মোহের ঘোরে!

বিরজা সে মুখ দেখিয়া অবাক্ হইল। অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পার্শ্বস্থ দাসীর প্রতি চাহিল, সে বলিল, "হাঁ, তিনিই।"

বিরজা ছুটিয়া গিয়া ভুবনের পদপ্রান্তে লুটিয়া পড়িল, বলিল, "দেব, এ অবস্থায় এখানে কেন? অমন করিয়া কাঁদিতেছেন কেন? আপনার সহিত আর কেহ নাই কেন? দেব-হৃদয়ে—পুণ্যময় হৃদয়ে—কষ্ট কেন?"

বিরজাকে পাঠক চিনিয়াছেন? এ সে পাইক আক্রান্তা গাড়ীমধ্যস্থা যুবতী, রাজীবপুরের প্রসন্ন রায়ের কন্যা। যেখানে ভুবন বসিয়া আছেন, ইহারই নাম রাজীবপুর। রাজীবপুরের পার্শ্বেই শ্মশান, প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। বাঙ্গালার নিকট হইতে শ্মশানে যাইতে একটা জানা মেঠো পথ আছে, ভুবন সেই পথে গিয়াছিলেন। পরে সেই পুত্রশোকাতুরা রমণীকে গ্রামে রাখিতে ভুবন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, পরে এই ঘাটে আসিয়া বসিয়াছেন, সুতরাং শ্মশান এখান হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে পড়িয়াছে।

বিরজা তাঁহার নিকটে গিয়া ঐরূপভাবে কথা কহিলে, তাঁহার মোহ অপনোদিত হইয়া গেল। তখন ভুবন বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি এক অপরিচিত ঘাটের ধারে বসিয়া রহিয়াছেন। যুবতীকে ঐরূপ ব্যাকুলতাময়ী কথা কহিতে শুনিয়া, তিনি তাহার

মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। ভুবন ত' আর বিরজাকে দেখে নাই, বিরজা গাড়ীর মধ্য হইতে কথা কহিয়াছিল, ভুবন বাহির হইতে উত্তর দিয়াছিল—কিন্তু বিরজা জ্যোৎস্নালোকে, লণ্ঠনের আলোকে, ভুবনকে চিনিয়াছিল। বিরজার কথার প্রত্যুত্তরে ভুবন বলিলেন, "আমি ত তোমাকে চিনিতে পারিলাম না!"

বিরজা বিনীত বচনে কহিল, "আমি আপনার শিষ্যা—বিরজা! আমি কাল রাত্রে আপনার নিকট নিষ্কাম ধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, আপনি কাল আমাদিগকে বাঙ্গালার পশুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন—আপনি আমার গুরু, আমি আপনার শিষ্যা। দেব, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, আপনি এ অবস্থায় এখানে কেন?"

জানুদ্বয় মধ্য হইতে মস্তকোত্তলন করিয়া ভুবন যখন বিরজার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, তখন রমণীগণ অবাক হইয়া দেখিল, যাহাকে তাহারা অভ্রান্তচিত্তে পাগল বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, সে সুন্দর যুবক। তাহার উন্নত ললাট, পূর্ণায়তন নয়নে উদার ভাব, জ্যোতিঃপূর্ণ মুখকান্তি তেজস্বী—অথচ তেজ অনুরাগে অতি কোমলভাবে দীপ্ত। প্রশস্ত বক্ষস্থল সুগঠন, বলিষ্ঠ দেহ যেন শত শত দুর্ব্বলের আশ্রয়-নিকেতন।

তখন রমণীগণ স্বর ফিরাইলেন। যিনি প্রথম বলিয়াছিলেন, 'ও পাগল' তিনি এখন বলিলেন, "ও রাজপুত্র। দেখছিস্ না, রাজার-গড়ন?

যিনি উহার প্রহার ভয়ে অত্যন্ত ভীতা ছিলেন, তিনি বলিলেন "দূর, ও মুনিঠাকুর।"

যিনি রাজপুত্র বলিলেন, তিনি তাঁহার প্রস্তাব অখণ্ডনীয় রাখিবার জন্য ভারী দুইটা প্রমাণ খাড়া করিলেন। প্রথম প্রমাণ—বিরজা পুনঃ পুনঃ বলিতেছে, আপনি একা কেন? রাজার ছেলে না হ'লে কিছু আর সৈন্যসামন্ত সঙ্গে থাকে না।

যিনি মুনিঠাকুর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তিনিও অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিবাদ ও যুক্তি দ্বারা অপরাপর প্রমাণ ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "রূপ কি আর রাজার ঘরে ভিন্ন হয় না; আমার মেজছেলের ও হ'তেও রূপ ছিল, ম'রে গেল তা কি কোর্‌বো। আর সৈন্য সামন্ত যে উহার সঙ্গে ছিল, তাহার প্রমাণাভাব। বিশেষতঃ উহার পরিচ্ছদ নিতান্ত দরিদ্রের ন্যায়। আর রাজপুত্র হ'লে বিরজার সঙ্গে উহার পরিচয় হইবে কি প্রকারে?"

যিনি রাজপুত্র বলিয়াছেন, তিনি আবার প্রমাণ জুটাইলেন, বলিলেন—রাজপুত্র না হইলে কি বাঙ্গালা হইতে বিরজাকে মুক্ত করিতে পারিত? এ সকল লোকে কি বাঙ্গালার নিকটে যেতে পারে?" বাঙ্গালার নামে তখন চতুঃপার্শ্বের গ্রামের লোক কম্পমান ছিল। আর বিরজার সহিত পরিচয়েরও একটা প্রমাণ দেখাইলেন, বলিলেন, "রাজপুত্র হউন, নবাবপুত্র হউন, সুন্দরী যুবতী রমণী গরীব হইলেও তাহার সহিত পরিচয়ের প্রমাণাভাব হয় না।"

তখন আর দু'চারটি রমণী রাজপুত্র সমর্থনকারিণীর পক্ষাবলম্বন করিলেন—বলিলেন, তাইত মুনিঠাকুর হইলে উহার মাথায় জটাভার, পরণে বাঘছাল, গায়ে বিভূতি ভূষিত হইত' অতএব ও নিশ্চয়ই রাজপুত্র। কেন না এক মুনিঠাকুর, আর না হয় রাজা-

রাজড়া হ'লে বাঙ্গালা হ'তে মুক্ত করিতে পারে, তা মুনিঠাকুর হইবার সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব, সুতরাং ও রাজপুত্র।

রমণীগণ যখন ভুবন সম্বন্ধে এইরূপ বিচারের তুমুলান্দোলন, বাদ প্রতিবাদ ও যুক্তি প্রমাণ দেখাইতেছিলেন, সেই সময় এক-দল সিপাহী লাল-পাগ্ড়ী মাথায় বাঁধিয়া ঢাল শড়্কী লইয়া সেই দিকে আসিতে লাগিল।

ভুবন তখনও সেই ভাবে সেই স্থানে বসিয়া বিরজার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন।

সিপাহীর দল ক্রমেই ভুবনের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। ভুবন রাজপুত্র বলিয়া যিনি তর্ক করিতেছিলেন, তিনি তখন সাহঙ্কারে বলিলেন, "ঐ দেখ্‌লি—ও রাজার পুত্র, ঐ ওর সৈন্যাদি আসিতেছে।" আর আর রমণীগণ অবাক হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে বিরজার চরিত্র সম্বন্ধে মনে মনে অনেক দোষারোপ করিল। কেহ কেহ বা তাহাকে ভাগ্যবতী বলিয়া ভাবিল।

সিপাহীর দল ভুবনের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে একজন বলিল, "ওরে ভাইয়া, ডাঁকুহো।"

অপর। কিয়া?

প্রথম। বদ্‌মাস্‌।

দ্বি-সি। আল্লাহো আক্‌বর। পাকাড়্‌তো হো।

দুইজন সিপাহী ছুটিয়া আসিয়া ভুবনকে ধরিল। ভুবন তাহা-দিগের স্পর্শে বড় বিষণ্ণ হইলেন, সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, প্রায় চল্লিশ জন সিপাহী, চারিজন অশ্বারোহী ফৌজ! ভুবন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কেন ধর? আমি কি করিয়াছি, কোথায় যাইতে হইবে?"

সিপাহী বলিল, "তোম্ বদ্‌মাস্।"

ভুবন। কি বদ্‌মায়েসী করিলাম ?

সিপাহীরা বলিল, "কাফের বদ্‌মাস্, চল্।" একজন সিপাহী ভুবনকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। আর একজন তাহাকে দুই চারিটা লাথি মারিল। একজন ভুবনকে বাঁধিতে লাগিল, আর একজন বিরজাকে ধরিতে গেল। সে চীৎকার করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। যে রমণীগণ সমালোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহারা দল ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া-ছুটিয়া কে কোথায় চলিয়া গেলেন। সিপাহীরা ভুবনকে মারিতে মারিতে লইয়া চলিল। সে সঙ্গে আরও অনেক বন্দী ছিল।

(১০)

সতীশচন্দ্র ও সরোজা সাতুরের মধ্যে সেই নিশাশেষেই প্রবেশ করিলেন। তখন সাতুর নিস্তব্ধে, নিঃশব্দে রহিয়াছে। বনদেবীকে আনিয়া সৈন্যগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করতঃ নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। কাজী সাহেবের বাড়ীও নিস্তব্ধ,—নিঃশব্দ। কচিৎ দুই একটা কুক্কুর ডাকিয়া উঠিতেছে, কচিৎ দুই একটা প্রহরীর সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে।

সতীশচন্দ্র ও সরোজা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোথায় যাইবেন, কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় একজন প্রহরী সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। চন্দ্রালোকে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিল, "কাহারা ও ?"

সতীশচন্দ্র মৃদুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হিন্দু।"

প্রহরী। সৈনিকবেশে, এ রাত্রে কোথা যাও?

সতীশ। চোর ধরিতে।

প্রহরী। কে চোর?

সতীশ। কাজী সাহেব।

প্রহরী। কি চুরি করিলেন?

সতীশচন্দ্র সদর্পে কহিলেন, "হিন্দু-কুল-ললনা। আমরা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিতে আসিয়াছি।

প্রহরীগণ রহস্য বুঝিল। কাজী সাহেবের হুকুম ছিল, আজ যদি কোন বিপক্ষহিন্দু, গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে, তবে তাহাকে ফটকে পুরিয়া রাখিও। সেই জন্যই প্রহরীগণ দল বাঁধিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা বলিল, "কাফের—বদখত্—সাবধান! আমরা কাজী সাহেবের গোলাম, আমাদের সম্মুখে তাঁহাকে গালি দিস্! এখনি তোদের মাথা লইব।"

সতীশের প্রজ্জলিত ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি পড়িল। তিনি উন্মত্ত প্রায় হইলেন, দৃঢ় করে করাল-তরবারি ধরিয়া প্রহরীদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং নিমেষ মধ্যে তাহাদিগকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। সেই সময় আর একদল প্রহরী আসিয়া জুটিল, সতীশচন্দ্রের ক্রোধানলে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারাও ভস্মীভূত হইয়া গেল। একজন অবশিষ্ট ছিল—সে ছুটিয়া গিয়া তাহাদিগের সেনাপতিকে সংবাদ দিল। সেনাপতি মহাশয় দুইজন বিদ্রোহী শুনিয়া অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সতীশচন্দ্রের প্রতিহিংসা-দাবানলে সে সৈন্য-কানন অল্পক্ষণ মধ্যেই ধ্বংস হইয়া গেল। সেনাপতি একজনকে কাজীর নিকট

সংবাদ দিতে পাঠাইলেন, সে ফিরিয়া না আসিতেই তিনি সতীশের আঘাতে ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। সে স্থানে মুসলমান শূন্য হইল।

তখন সরোজা বলিল, "এখন কি করিবেন?

সতীশ বলিলেন, "কি আর করিব? কাজী সৈন্য আসুক।"

সরোজা। তাহাদের সহিত গোলা, গুলী, কামান, বন্দুক আসিবে, তাহার সম্মুখে কেমন করিয়া টিকিবেন?

সতীশ। না হয় মরিব।

সরোজা। তা হ'লে বনদেবীর উদ্ধার হইবে না।

সতীশ চিন্তাযুক্ত হইলেন, বলিলেন, "আমি বাঁচিয়া থাকিলেই কি তাহার উদ্ধার হইবে?"

সরোজা কি ভাবিল—শেষে বলিল, "আপনি শীঘ্র চলিয়া যান, বিলম্ব করিলে যাইতে পারিবেন না; ঐ শুনুন, ফৌজ সকল কোলাহল করিতেছে।"

সতীশচন্দ্র সবিস্ময়ে কহিলেন, "তুমি যা'বে না?"

সরোজা। না, আপনি শীঘ্র যান।

সতীশচন্দ্র ক্ষণিক কি ভাবিলেন, শেষে অশ্বকে তীরবেগে চালাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

সরোজা তাড়াতাড়ি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অশ্ব ছাড়িয়া দিল। মস্তকের উষ্ণীষ, গায়ের পরিচ্ছদ সকল পরিত্যাগ করতঃ পূর্ব্বপরিহিত শাড়ী ভাল করিয়া পরিধান করিয়া একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

কাজী সাহেব শীঘ্রই সসৈন্যে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিদ্রোহীরা পলায়ন করিয়াছে। তখন কয়েকদল অশ্বারোহী ও

পদাতিক সিপাহীদের—বিদ্রোহী ধরিতে চারিদিকে প্রেরণ করিলেন।

ওদিকে নহবতখানায় ললিতরাগিনীর তান উঠিল। সকলে জানিল—রাত্রি পোহাইল।

যে সকল সিপাহী বিদ্রোহী ধরিতে গিয়াছিল, তাহাদেরই একদল গিয়া ভুবনকে ধরিয়া আনিয়াছে।

যেমন একদল ভুবনকে ধরিয়া আনিয়াছে, ঐরূপ প্রত্যেক দলই বহুতর নিরপরাধী ব্যক্তিকে ধরিয়া বাঁধিয়া আনিয়া বিচারার্থ কাজীর নিকট হাজির করিতে লাগিল। কিন্তু আসল বিদ্রোহী সতীশ ও সরোজাকে কেহ দেখিতেও পায় নাই। যে সকল নিরপরাধী হিন্দু, শয্যা হইতে ভোরে উঠিয়াছিল, যাহারা সকাল-সকাল কৃষিকার্য্য করিতে মাঠে যাইতেছিল, যে সকল মৎস্যজীবিগণ নদীতে মৎস্য ধরিতেছিল, যে সকল ভিক্ষুক ভিক্ষায় যাইতেছিল, যাহারা অসন্দিগ্ধচিত্তে রাজ দরবারে যাইতেছিল, সিপাহীরা তাহাদিগকেই দলে-দলে পালে-পালে বাঁধিয়া আনিয়াছে। কাজী সাহেবের হুকুমে তাহাদিগকে ফটকে বন্দী করা হইল।

(১১)

দ্বি-প্রহরের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। রৌদ্রের উত্তাপে মাটী ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। গাছ, পালা, লতা, পাতা সব যেন আগুন! পাখীগুলি গাছের পাতার মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে। প্রখর রবির করে ফুলগুলি শুকাইয়া পড়িয়াছে—কেবল

সরোবরে নলিনীসুন্দরী প্রস্ফুটিত হইয়া সূর্য্যপানে চাহিয়া আছে। টপ্পা-নবীশ ভোম্‌রা তার নিকট গিয়া দুই একটা টপ্পা গাইতে আরম্ভ করিয়াছে, রবির গভীর-প্রণয়জ্ঞা নলিনী সে হাল্‌কাভাব ভাল না বাসিয়া মাথা নাড়িল। ভোম্‌রা তখন অন্য গান ধরিল, নলিনী তাহাতেও মাথা নাড়িল। ভোম্‌রা যে গান গাহিতে যায়, নলিনী তাহাতেই মাথা নাড়ে। ভোম্‌রা বাহারে আর তেমন কড়ামিঠে লাগাইতে পারিল না, তাহার বেহাগে কড়িমধ্যম ফুটিল না, ইমনগুলা কড়িমধ্যমের জ্বালায় ঘ্যানোর-ঘ্যানোর করিয়া উঠিল। এইরূপে ভোম্‌রার কোন গানই নলিনীর পছন্দ হইল না—সে তখন তিতিবিরক্ত হইয়া ভোঁ করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

এই দ্বি-প্রহরের সময় সরোজা একটা অশ্বত্থ তরুতলে বসিয়া মস্তকের যত্নাবদ্ধ চুলের বেণী খুলিয়া তাহাতে ধূলা মাখাইয়া চুল-গুলি আলু-থালু করিয়া ফেলিল। পরিধেয় মূল্যবান্ শাড়ী পরিত্যাগ করিয়া একখানি জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিল। গাত্রা-বশিষ্ট অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করিল। শেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধনেত্রে যুক্তকরে মনে মনে দুর্গার দশভুজামূর্ত্তি আঁকিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "মা! দীন-দুঃখহারিণী, অনাথ-পালিনী! আমি যেন প্রিয়সখীকে উদ্ধার করিতে পারি। দুর্ব্বলের সহায়, বিপন্নের বন্ধু, মা!—তুমি আমার সহায় হও।" বলিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল।

যাইতে যাইতে পথিমধ্যে রসকলি্‌কাটা কালো-কালো বর্ণের এক বৈষ্ণবীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বৈষ্ণবী, দুঃখিনী সুন্দরী মেয়েটি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় থাকে গা? তোমার নাম কি, তোমরা কি জাতি?"

সরোজা বলিল, "আমার নাম রঙ্গিনী। আমরা সদ্গোপ। কোথাও দাসীপণা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিব বলিয়া এই গ্রামে আসিয়াছি, আমার কেহ নাই।"

বৈষ্ণবী। তুমি কি বিধবা?

সরোজা। হাঁ।

বৈষ্ণবী। কাজী-বাড়ী থাকিতে পার?

সরোজা। তা, আমি ত' দাসীপণা করিতে এসেছি, যেখানেই সেখানে হ'লেই হ'ল।

বৈষ্ণবী। তা যদি স্বীকার কর, তবে আজই ঠিক ক'রে দিতে পারি, তাঁদের একটি হিন্দু দাসীর প্রয়োজন হইয়াছে।

সরোজা। কেন, হিন্দুদাসী কি হইবে?

বৈষ্ণবী। তা তুমি শোন নি? মুর্শিদাবাদের নবাব, সোদপুরের জমিদারের মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছেন, জমিদার মহাশয়েরও তাহাই ইচ্ছা। কিন্তু গ্রামের লোক, দেশের লোক, তাঁর ভাইয়ের এবং মেয়ের সকলেরই অমত, সকলেই এ বিবাহ দিতে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করায় তিনি কাজীর সহিত যোগ করিয়া কাজী-সৈন্য লইয়া গিয়া তাঁহার মেয়েকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এখন লোকের নিকট তিনি বলিতে পারিবেন, আমি আর কি করিব, জোর করিয়া লইয়া গেল। যাহা হউক, সে মেয়ে বলিতেছে, আমি কখনই হিন্দু হইয়া মুসলমানে আত্ম-সমর্পণ করিব না। সে মুসলমানের হাতের জল খায় না। বোধ হয় জমিদার মহাশয় কাজীকে বলিয়া দিয়াছেন, এক সপ্তাহ আপনাদের বাড়ীতে রাখিয়া উহার মত হইলে মুর্শিদাবাদে পাঠাইও। তাই এক সপ্তাহ সে মেয়ে যাহা বলিবে—তাহাকে

আয়ত্ত করিবার জন্য এক সপ্তাহ তাহাই করিতে হইবে। সে মুসলমানের ছোঁয়া জল খাইবেনা, কাজেই হিন্দুদাসীর প্রয়োজন।

রঙ্গিনী। তা এমন বোকা মেয়েও ত কোথাও দেখিনি, নবাবকে বিবাহ করিতে অসাধ!

বৈষ্ণবী। তাই ত' বাছা! এখন তুমি থাকিতে পারিবে?

রঙ্গিনী। পারিব না কেন?

বৈষ্ণবী। কত মাহিনা নিবে?

রঙ্গিনী। মাহিনা কি করিব? ভাত-কাপড় পেলেই হ'ল।

বৈষ্ণবীর ঠোঁটে হাসি ফুটিল, মুখে আহ্লাদের চিহ্ন দেখা দিল। সে তখন মনের ভিতর ভাবি একটা সুবিধাজনক ভাবনা ভাবিয়া লইল, বলিল, "তা এক পয়সাও নিবে না?"

রঙ্গিনী। কিছু না। লইয়া কি করিব?

বৈষ্ণবী। তা বেশ বেশ, তবে আমার সহিত আমার বাড়ী এস, তারপর কাজী-বাড়ী নিয়ে যাব অখন।

রঙ্গিনী মাহিনা লইবে না শুনিয়া বৈষ্ণবী তাহাকে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে, এজন্য বড় আহ্লাদিত হইল, রঙ্গিনীও বুঝি বৈষ্ণবীর দ্বারা শীঘ্র কাজ সম্পন্ন করিয়া লইবে বিবেচনায় বেতন চায় নাই, রঙ্গিনীর আসল রঙ্গ সুসিদ্ধ করিবার ইচ্ছাই তাহাই।

(১২)

কাজীপুত্র রহিম-সার দুইটি বিবাহ হইয়াছে। জ্যেষ্ঠার নাম জোবেদী ও কনিষ্ঠার নাম রোসেনারা। রোসেনারা সুন্দরী, জোবেদী কালো, অন্যান্য অঙ্গসৌষ্ঠব মন্দ নহে। তবে দাঁতগুলি কিছু উঁচু আর ঠোঁট দুখানি বড় পুরু। রোসেনারা সরল প্রকৃতি চতুরা ও রহস্যপ্রিয়া, জোবেদী কুটিলা ও কোন্দল-প্রিয়া। রোসেনারার আজিও সন্তানাদি কিছু হয় নাই। জোবেদীর গুটিকতক সন্তানও হইয়াছে।

যে গৃহে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী বনদেবী রহিয়াছে, সেখানি নানাবিধ কারুকার্য্য-খচিত হইলেও তাহা নিস্তব্ধ। ক্ষীণ দীপালোক—অযত্নে তাহা ক্ষীণ হইয়াছে, কে তাহাকে যত্ন করে? ক্ষীণ-দীপালোক একটা বিষাদপূর্ণ আশঙ্কার ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অজ্ঞাত—অদৃশ্য একটা বিভীষিকা, আপনার নিঃশব্দ-গর্জ্জিত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস শব্দে, গৃহের ঘোর স্তব্ধতাকে যেন স্তব্ধ করিয়া দিয়া বনদেবীর চক্ষে মূর্ত্তিমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বনদেবী মুদিত চক্ষে দেখিতেছে, সেই করাল মূর্ত্তির অন্ধকার হস্তে তীক্ষ্ণ-শাণিত কৃপান মুহুর্মুহু তুলিতেছে, মুহুর্মুহু ঝলসিত হইতেছে, মুহুর্মুহু বনদেবীর বক্ষের প্রতি উন্মুক্ত হইয়া ঝুলিতেছে, বুঝি এই আসে-আসে, বুঝি এই পড়ে-পড়ে, বুঝি এই বনদেবীর বুকে বিঁধে-বিঁধে। বনদেবী সেই ভীম-তরবারির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ, প্রতিক্ষণে যেন বক্ষে অনুভব করিতেছে। বনদেবীর চক্ষে পলক নাই, হৃদয়ে শোণিত বহিতেছে না, বনদেবী অজ্ঞান পাষাণমূর্ত্তির মত সেই অন্ধকার আশঙ্কার দিকে চাহিয়া আছে।

যাহা অন্ধকার, যাহা অদৃশ্য—তাহার উপর বলপ্রয়োগ চলে না, তাহার সহিত যুদ্ধ করা যায় না। তাহা সর্ব্বগ্রাসী অনন্ত—আর এইজন্যই তাহা এত ভয়ানক। শত সহস্র নিশ্চিত বিপদের মধ্যে যে হৃদয় অটলভাবে চলিয়া যায়—সে হৃদয়ও এই অনির্দ্দেশ্য ভয়ের নিকট তাই কম্পমান।

বনদেবীর পীড়িত-ক্লিষ্ট অবসন্নমূর্ত্তি দেখিয়া অচেতন দীপ-শিখাও যেন আকুল হইয়া উঠিয়াছে, সে থাকিয়া-থাকিয়া কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহা যেন তাহার হৃদয়ের মর্ম্মভেদী এক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস।

সহসা দ্বারদেশে কাহার পদশব্দ হইল। বনদেবী চমকিয়া বিষাদ-ভরা মুখখানি তুলিয়া চাহিলেন, গৃহমধ্যে জোবেদী ও রোসেনারা প্রবেশ করিল। রোসেনারা দেখিল, উন্মুলিতা বাসন্তী-লতা-গাছটি পড়িয়া আছে, বিষাদ কালীমায় সে মুখ আবৃত; ক্ষীণ দীপালোকে দেখিল—তবুও সে মুখে সৌন্দর্য্য যেন ধরে না। মনে মনে ভাবিল, রাহুগ্রস্থ হইলেই কি চাঁদের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় গা? জোবেদী দেখিল, সে কাল্‌পেঁচা কেঁদে-কেঁদে আরও কাল্‌পেঁচা হইয়াছে। তাহারা দু'জনে শয্যাপার্শ্বে বসিল। বনদেবী একটু সরিয়া গেল—উঠিলও না, কথাও কহিল না। তিনজনেই নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ পরে জোবেদীই সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল,—বলিল, "তা গুমরই বা কেন? আমরা এলাম একটা কথাও কি কইতে নাই?"

রোসেনারা বলিল, "তোমার সহিত কথা কহিবে কেন? তুমি কালো, ও সুন্দর। তুমি বুড়ো হ'য়েছ, ও যুবতী।"

জোবেদী মহা ক্রোধিত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,

"তুই আমার সহিত ঝগড়া না করে থাকতে পারিস্ না কেন লো পোড়ার মুখি? তুই আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলবি?" জোবেদী রাগ ভরে উঠিয়া গেল।

রোসেনারা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমাকে উঠাইয়া দিবার জন্যই ত' আমি ওরূপ কথা পাড়িয়াছিলাম।" শেষে বনদেবীর বদন প্রতি চাহিয়া বলিল, "তুমি উঠিবে না? আমার সহিত কথা কহিবে না? আমি তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি।"

দুঃখে কষ্টে জর্জ্জরিত বনদেবী অতি মৃদু—অতি ধীরে বলিলেন, "তুমি কে?"

রোসে। আমি রোসেনারা, কাজাসাহেবের পুত্রবধূ।

গৃহে একটি মুসলমান দাসী প্রবেশ করিল। রোসেনারাকে দেখিয়া করযোড়ে বলিল, "হিন্দু দাসী এসেছে, অনুমতি হয়ত' সে গৃহপ্রবেশ করিতে পারে।"

রোসেনারা বলিল, "হাঁ, তাহাকে আসিতে বল।"

দাসী ফিরিয়া গিয়া হিন্দু দাসীকে বলিল, "অনুমতি হইয়াছে, ঘরে চল।" তাহার প্রাণের ভিতর দুর্-দুর্ করিতে লাগিল, মুসলমান দাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহপ্রবেশ করিল।

বনদেবী তখন উপাধানে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। দাসী গৃহপ্রবেশ করিলে রোসেনারা তাহার আপাদমস্তক উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "দাসী, তোমার এত রূপ! তুমি কি জাত?"

আমি, সদ্গোপ, আমার নাম রঙ্গিনী।" রঙ্গিনী এই কথা বলিলে রোসেনারা বলিল, "তুমি শীঘ্র করিয়া জল আনিয়া উহাকে

পান করাও। আমি এখন চলিলাম।" রোসেনারা উঠিয়া গেল।

রঙ্গিনী তখন বনদেবীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিল, বলিল, "উঠিয়া ব'স।"

সে স্বরে যেন বনদেবীর শুষ্কহৃদয়ে আশা-শিশির পতিত হইল, চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "তুমি এখানে কেন সখি!"

রঙ্গিনী বলিল, "চুপ, এখন অন্য কথা নহে। এখন কিছু খাবে না?"

বনদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মুসলমানের পুরীতে কিছু খাব না, যদি এ পাপ পুরী হইতে উদ্ধার হইতে পারি, তবে আবার খাইব, নচেৎ আর না।"

রঙ্গিনী কোন কথা না কহিয়া উঠিয়া বাহিরে গেল, আর একজন দাসীকে ডাকিয়া পুকুর দেখাইয়া দিতে বলিল, সে দেখাইয়া দিল—সেখান হইতে একঘটি জল আনিল। বৈষ্ণবী তাহাকে চারিটা সন্দেশ খাইতে দিয়াছিল, সে তাহার একটা খাইয়া তিনটা আঁচলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, তাহা খুলিয়া বনদেবীর মুখে গুঁজিয়া-গুঁজিয়া দিল, বনদেবী তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ করিল। রঙ্গিনী জলের ঘটি দিল, বনদেবী ঢকঢক করিয়া একঘটি জল খাইল।

---

(১৩)

সাঁঝের আঁধারে বিশ্ব-প্লাবিত, পূর্ব্বাকাশে বসন্তের চাঁদ তখন কেবল উঠিবার উপক্রম করিতেছে। এই সময় একটা অশ্বথ তরুতলে জমাট আঁধারের ভিতর দাঁড়াইয়া সতীশচন্দ্র ও সরোজা। সরোজা বলিল, "আজ এক সপ্তাহ পূর্ণ হইল। কা'ল সকালেই বনদেবী মুর্শিদাবাদে প্রেরিতা হইবে। অমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, কিছুতেই একসঙ্গে আমি ও বনদেবী উদ্ধার হইতে পারি না। বনদেবী যে গৃহে থাকে, তাহার অন্দরমহলে যে খোজা প্রহরী আছে, সেখান হইতে কেবল আমি আসা-যাওয়া করিতে পারি, অন্যে পারে না—এমনই কঠিন শাসন। অন্যে যাইতে হইলে অন্দরের সদর পথ দিয়া যাইতে হয়—আমার পক্ষে উভয় পথই অবারিত। আমি বিবেচনা করিয়াছি; আপনি গড়ের নিকট দাঁড়ান, আমার কাপড়াদি পরাইয়া আমার বেশে বনদেবীকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমি সদর পথ দিয়া বাহির হই।"

সতীশ। কত রাত্রে বনদেবী আসিবে?

সরোজ। একপ্রহরের সময় যখন নহবত প্রথম বাজিবে, তখন তাহাকে বাহির করিয়া দিব, আপনি গড়ের নিকট দাঁড়াইবেন।

সতীশ। দেখো, যেন আমায় কষ্ট দিও না।

সরোজা। না, ঠিক্ সেই সময়েই পাঠাইব।

এমন সময় চন্দ্রদেব কোমল কররাশি পৃথিবীতে ঢালিলেন, আঁধারের জমাট ভাঙ্গিয়া গেল! অশ্বথগাছের ডালের মধ্য দিয়া পাতার রাশি ভেদ করিয়া চাঁদের কিরণ, সরোজা ও সতীশচন্দ্রের

মুখের উপর পড়িল। সরোজার কথার প্রত্যুত্তরে সতীশচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দূর পোড়ারমুখী, সেই কষ্ট কি? যেন অসাবধানে ধরা প'ড়ে আমায় কষ্ট দিও না।"

সরোজা সেকথা শুনিয়া চাঁদের আলোকে একবার সতীশের মুখের দিকে চাহিল। প্রাণের ভিতর একটা সুখের উর্ম্মি নাচিয়া উঠিল, বলিল, "আমি ধরা পড়িলে কি আপনার কষ্ট হইবে?"

সতীশ। সরোজা, আজিও কি বুঝিতে পার নাই যে, আমি তোমায় কত ভালবাসি!

সরোজ। তা বুঝি বইকি—বুঝি বলিয়াই এ সংসার-মরুভুমে কেবল আপনার মুখ চাহিয়া আছি। কিন্তু—

সতীশচন্দ্র ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কিন্তু কি সরোজা?"

সরোজার চোকে জল আসিল, বলিল, "বড় আশা ছিল, গৃহে থাকিয়া তোমাকে ভালবাসিয়া সুখে জীবন যাপন করিব—তাহা বুঝি হইল না।" সতীশ বলিলেন, "কেন?"

সরোজা। নবাবের সহিত যেরূপ ঘটনা ঘটিয়া উঠিল, ইহাতে যে আর কথা ফুটিল না।

সতীশ। বেশ ত' সরোজা, ধর্ম্মরক্ষার জন্য যদি আমি মরি, আর তুমিও মর, যদি শাস্ত্র সত্য হয়, ধর্ম্ম সত্য হয়, তবে সেই অনন্তধামে উভয়ে সম্মিলিত হইব।

সরোজা। সেইজন্যই ত' এ সংসারে ঝাঁপ দিয়েছি। যদি আমি আগে মরি, দাসী ব'লে মনে রেখ।

সতীশ। এখন যাও, উপায় দেখগে।

সরোজা। আপনি এখন কোথায় যাইবেন?

সতীশ। কোথাও না, এইখানেই থাকিব।

"তবে চলিলাম" বলিয়া সরোজা একবার সতীশের মুখের প্রতি চাহিয়া চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি একপ্রহর হইল। নহবতখানায় "দগড়া-নগড়া-গড়্গড়ি" বলিয়া দামামা কি বলিতে লাগিল। তার সঙ্গে মধুর ঝিঁঝিট-খাম্বাজ রাগিণী মানব প্রাণে অপার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

সরোজা ব্যতিব্যস্ত হইয়া বনদেবীকে বলিল, "সখি, আর বিলম্ব করিও না, এতক্ষণ সতীশচন্দ্র গড়ের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তুমি যাও। আমার ঐ কাপড় পরিয়া বাহির হও, প্রহরী যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে ব'লো—আমি রঙ্গিনীদাসী।"

বনদেবী সরোজার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি যাবে না?"

সরোজা ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, "এতক্ষণ বুঝাইলাম কি?"

বনদেবী এদিক ওদিক করিয়া নিজ বসন ভূষণাদি পরিত্যাগ করতঃ সরোজার একখানি কাপড় পরিয়া গৃহের বাহির হইল। দ্বারদেশে প্রহরী বলিল, "তোম্ কোন্ হ্যায়?"

বনদেবী ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল, "আ—মি, নূতন বেগম—দাসী।"

প্রহরী বলিল, "যাঁও।" বনদেবী চলিয়া গেল। প্রহরী ভাবিল নূতন দাসী ত' ওরূপ ভয়ে ভয়ে কথা কহে না—এ নূতন কে? আর তাহার গলার স্বরও ওরূপ নহে। প্রহরী বনদেবীর অনুসরণ করিয়া কিয়দ্দূর যাইয়া দেখে, গড়ের ধারে এক যুবক দাঁড়াইয়া। বনদেবী তাহার নিকট গমন করতঃ কাঁদিয়া উঠিল। সে যুবক বলিল, "মা, চুপ কর, আর ভয় নাই।" এই কথা বলিয়া

বনদেবীর হস্তধারণ করতঃ একটু পিছাইয়া গেল, সেখানে একটা বৃক্ষের ডালে অশ্ব বাঁধা ছিল, দুইজনে তাহাতে উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই কার্য্য সমাধা করিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া গ্রামের বাহির হইয়া পড়িল।

প্রহরীর সর্ব্বাঙ্গ—শরীর কাঁপিল, সে ছুটিয়া নিজ স্থানে গমন পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিল। দু'চার জন প্রহরী, দু'চার জন দাসী সেখানে আসিয়া জুটিল। প্রহরীর নিকট বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দাসীরা ছুটিয়া গিয়া সংবাদ প্রচার করিল। সকলে বনদেবীর গৃহে গমন করিল, দেখিল, সেখানে বনদেবী নাই—রঙ্গিনা দাসী নিদ্রা যাইতেছে। এটা কৃত্রিম নিদ্রা। তাহাকে গুঁতা মারিয়া তুলিল, বলিল, "নূতন বেগম কোথায় ?"

রঙ্গিনী চোক কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বলিল, এই ঘরে ত' ছিলেন—কোথায় গেলেন ?"

পরে প্রকৃত বৃত্তান্ত সরোজা শুনিল, মনে মনে বড় আশঙ্কা গণিল। সকলে তাহাকেই দোষী বিবেচনা করিয়া তাহার হাতে পায়ে বেড়ি দিয়া বন্দী করিল। ওদিকে অশ্বারোহী সেনাগণ চারিদিকে চোর ধরিতে বাহির হইল।

(১৪)

সাতুর হইতে প্রায় সার্দ্ধক্রোশ অন্তরে মূর্ত্তিমতী এক কালীকা প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই কালীবাড়ীর উত্তরে প্রকাণ্ড এক বন, পশ্চিমে কায়ড়ার সুবৃহৎ খাল ও পূর্ব্বধারে কুমার-নদ ইহার পাদ-মূল বিধৌত করিয়া প্রবাহিত। এই দুইটি জলময় ও বন দ্বারা

সংরক্ষিত হওয়ায় সহসা কোন যোদ্ধা সে স্থান আক্রমণ করিতে সাহসী হইত না। তখনকার লোকে জানিত সে স্থানে অনেক ডাকাইতের বাস, এবং সেই হইতে অদ্যাপিও সেই কালীকে লোকে "ডাকাতে-কালী" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

এই কালীদেবীর সম্মুখে এক মৃণ্ময় ঘট, ঘটের উপর একটি সিন্দুর-চর্চ্চিত নারিকেল ফল আর অতসী, অপরাজিতা, পদ্ম প্রভৃতি চন্দনচর্চ্চিত বহুবিধ কুসুমরাশি ও সজল বিল্বপত্রনিচয় সেই ঘট হইতে দেবীর পাদপদ্ম পর্য্যন্ত স্তূপাকারে রহিয়াছে। সে ভয়ানক অথচ প্রশান্ত মূর্ত্তিখানি দেখিলে হৃদয় স্বতঃই ভক্তি রসাপ্লুত হয়।

দেবী প্রতিমার সম্মুখে জটাজুটধারী—পরিধানে গৈরীক মৃৎ-রঞ্জিত বসন, গলে রুদ্রাক্ষ, ভালে রক্তচন্দন, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি পরিলেপিত এক সন্ন্যাসী পদ্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ভক্তি ভরে তানলয় মান সংযোগ স্তব করিতেছেন ;—

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে॥
মহদাদ্যণুপর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ॥
ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন॥
ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ।

ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং দেবিতুমর্হতি।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনুঃ॥
চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্ভুজাষ্টভুজা তথা।
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী॥
ত্বং সর্ব্বরূপিণী দেবী সর্ব্বেষাং জননী পরা।
তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ॥

পরমভক্ত ভক্তিভাবে সজলনেত্রে গদ্গদস্বরে কালভয়হারিণী কালীকার স্তব করিতেছেন; এমন সময় "জয় মা কালিকে" বলিয়া কে যেন কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইল। স্বর—বামাকণ্ঠ-বিনিঃসৃত। সচকিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, গৈরিক বসন পরিধানা, রুদ্রাক্ষসুশোভিতা, ত্রিশূলধারিণী এক সুন্দরী ভৈরবী-মূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। অপূর্ব্ব রূপ—মনোহর কান্তি! এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী সর্ব্বসুলক্ষণা রমণী-রত্ন যেন বিধাতা কোন অভীষ্টসিদ্ধ মানসে সৃজন করিয়াছেন। বয়স অল্প, কিন্তু অবয়ব শান্ত ও গম্ভীরতাব্যঞ্জক, দেখিলে পাষাণ হৃদয়েও ভক্তিরসের সঞ্চার হয়। সন্ন্যাসী ক্ষণকাল সচকিতের ন্যায় তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "মা, এ বেশে এখানে যে?" সন্ন্যাসীর বাক্য শেষ না হইতেই সে দেবীমূর্ত্তি 'কি হ'ল কি হ'ল' বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী তখন দেবীর চরণামৃত-সিঞ্চনে ভৈরবীর চৈতন্যোৎপাদন করিলেন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ভৈরবী বলিলেন, "দেব! মুসলমানের অত্যাচার কি দমিত হইবে না? মা কি অত্যাচারীর হস্ত হইতে অত্যাচারিতের ত্রাণ করিবেন

না? দুষ্টের দমন করিয়া শিষ্টের প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইবেন? কলিকাল বলিয়া কি মা অন্তর্ধান হইয়াছেন?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "পাগ্লি, কলিকালে কি দেব-দেবী লুপ্ত হয়? মানুষের চিন্তা এখন কুপথগামী, তাই লোকে দেব দেবী প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। নতুবা সে অবিনশ্বর। দেব দেবীগণ চিরকালই সমভাবে সমান মহাত্ম্যে থাকিবেন—যদি কখনও তাঁহাদিগের লোপ হয়, তবে এ জগতের কিছুই থাকিবে না, অনন্তের অনন্তগ্রাসে সব লুপ্ত হইয়া যাইবে।"

ভৈরবী। মানুষের চিত্ত কুপথগামী হইলে কি দেব দেবী দেখা যায়?

সন্ন্যাসী। সে দিন জানিয়াছি তুমি কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছ, বলিলে বোধ হয় বুঝিতে পারিবে, অতএব তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে দেব দেবী কি, তাহা বুঝাইয়া দেই :—

"মনোময় জগতীয় সূক্ষ্ম আধার পদার্থসকলের নামই দেবদেবী। তন্ত্রাদিতে অসুর, পিশাচ প্রভৃতিও স্থল বিশেষে দেবনামে অভিহিত হইয়াছে। যাহারা পিশাচের আরাধনা করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট পিশাচেরাই দেবতা। প্রকৃত কথা, আরাধ্য অদৃষ্টশক্তির নামই দেবদেবী। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে যাঁহারা আরাধ্য, হিন্দুরা তাহাদিগকেই দেবতা বলেন এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম-ফলপ্রদ শক্তি সকল অসুর—তাহারা বেদাদি অনুসারে আরাধ্য নহে।"

ভৈরবী। কর্ম্মফলপ্রদ শক্তি যদি দেবদেবী-ই হয়, তবে ত দেবদেবীর উপাসনা করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু দেবদেবীর উপাসনা সকাম কর্ম্ম।

সন্ন্যাসী। হিন্দু শাস্ত্রের কোথাও দেবদেবীর উপাসনা এরূপ উক্ত হয় নাই, আরাধনা শব্দই পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে।

ভৈরবী। উপাসনা ও আরাধনা কি ভিন্নার্থবোধক?

সন্ন্যাসী। সম্পূর্ণ। ইহাই না বুঝিতে পারিয়া বৈদিক এবং নিরাকারবাদীতে এত বাদবিসম্বাদ চলিয়া থাকে। উপাস্য পদার্থে ভক্তি স্থাপনপূর্ব্বক আপনহারা হইবার চেষ্টার নাম উপাসনা—আর আরাধনা কথাটির অর্থ, সন্তুষ্ট করা। আরাধনায় আপনহারা হইতে হয় না। উপাস্যদেব যেদিকে লইয়া যাইবেন, আমি সেই দিকে চলিব, এইরূপ ভাব সংস্থানের চেষ্টার নাম উপাসনা। কিন্তু আমার অভিপ্রায়ানুযায়ী কর্ম্মে দেবদেবীকে নিযুক্ত করিবার জন্য, তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নাম দেবদেবীর আরাধনা। দেবদেবীর আরাধনা-বিষয়ক যে ক্রিয়া, তাহার নাম যজ্ঞ। দেবদেবীর অর্থটা বুঝিতে পারিয়াছ?

ভৈরবী সে কথার উত্তর না করিতে করিতে সে গৃহে এক যুবক প্রবেশ করিলেন। যুবক সতীশচন্দ্র—ভৈরবী বনদেবী।

সতীশচন্দ্র কালীবাড়ীর সন্ন্যাসীকে জানিতেন। জানিতেন এখানে কাজীর সন্ধান পাওয়া দূরের কথা, স্বয়ং নবাবেরও আধিপত্য নাই। তাই সেদিন বনদেবীকে আনিয়া সন্ন্যাসীর নিকট রাখিয়া সরোজা ও ভুবনের অনুসন্ধানে পুনরায় সাতুরে গমন করিয়াছিলেন। ভুবনের আবদ্ধের কথা বনদেবীও শুনিয়াছে, বনদেবীকে ভৈরবী সাজাইয়া ভৈরবাচার্য্য (সন্ন্যাসীর নাম ভৈরবাচার্য্য) ভৈরবীদিগের নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

বিশেষ বিপদে পড়িয়া সতীশচন্দ্র সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়াছেন, সে বিপদের কথা শুনিয়া বনদেবীও একবারে আকুল

হইয়াছে। সতীশকে সন্ন্যাসী বলিয়া দিয়াছিলেন, যদি বিশেষ বিপদে পড় ; যাহা হইতে উদ্ধার হওয়া তোমার সাধ্যাতীত হইবে, তাহা আমাকে জানাইও।

সতীশচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসীকে বলিলেন, "আপনি যাহা বলিলেন, তাহা অনেকাংশে বুঝিয়াছি, এক্ষণে দয়া করিয়া বিষদ করিয়া বুঝাইয়া দিন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "সে কথা বলিবার আগে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা দেবদেবী কাহাকে বল?"

সতীশ। কেন? এই ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, শিব, গণপতি, দুর্গা, কালী প্রভৃতি।

সন্ন্যাসী। আমি বৈদিক দেবতার কথা বলিতেছি, দুর্গা প্রভৃতির কথা এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে, উহা পরে বলিব, এক্ষণে ইন্দ্র দেবতাই আমাদের অলোচনীয় হউক। ইন্দ্র কে জান?

সতীশ। জানি, স্বর্গদেবতার রাজা, অদিতি গর্ভে কশ্যপের পুত্র।

সন্ন্যাসী। অদিতি কে জান?

সতীশ। ইন্দ্রাদি দেবগণের মা।

সন্ন্যাসী। তাঁহাই বটে, কিন্তু হস্তপদবিশিষ্ট মুনি-পত্নী নহেন, তিনি অনন্ত প্রকৃতি। * আকাশ—পুরুষ, পৃথিবী—স্ত্রী। বেদে এই দম্পতি, সমস্ত জীবের পিতা ও মাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বেদে অনেকস্থলে আকাশকে পিতা ও পৃথিবীকে মাতা বলিয়া

---

* গ্রীক পুরাণে Ouranos দেবের পত্নী Gaia দেবী। Gaia সংস্কৃতে "গো।" গো শব্দে পৃথিবী—তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

কীর্ত্তিত হইয়াছে। "তন্মাতা পৃথিবী তৎ পিতাদ্যৌঃ" আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা—পৃথিবী আকাশের পত্নী -পৃথিবী ও আকাশের সংযোগে জীব সৃষ্টি। ঋগ্বেদ-সংহিতায় আছে, "দ্যাবা পৃথিবী জনত্রী।" বা "দ্যৌস্পিতা পৃথিবী মাতর ধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্ব্বসবো" আকাশ হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক কশ্যপ কে ?—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আকাশ পিতা। কশ্যপ অর্থে কচ্ছপ, ইহা বৈদিক ও আভিধানিক অর্থ। সংস্কৃতে কচ্ছপের নাম কূর্ম্ম। যে করিয়াছে সেই কূর্ম্ম। কূর্ম্ম হইতে হইতে কালক্রমে সেই কর্ত্তা আবার কশ্যপ হইল, কেননা কূর্ম্ম কশ্যপ একার্থ বাচক শব্দ। যিনি সকল করিয়াছেন, যিনি বেদে প্রজাপতি বা পুরুষ বলিয়া অভিহিত—তিনি কূর্ম্ম—তিনিই এই কশ্যপ। এই কথাটা বোধ হয় তোমার তত বিশ্বাস হইল না, অতএব বেদ হইতে প্রমাণ দেখাইতেছি।

"স যৎ কূর্ম্মো নামঃ"। এতদ্বৈরূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত যদসৃজত অকরোত্তৎ। যদকরোত্তস্মাৎ কূর্ম্মঃ। কশ্যপো কূর্ম্মঃ। তস্মাদাহুঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কশ্যপ্যঃ ইতি। (শতপথ ব্রাহ্মণ ৭।৪।১৫)।

ইহার অর্থ—কূর্ম্ম নামের কথা বলা যাইতেছে। প্রজাপতি এই রূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃজন করিলেন। যাহা সৃজন করিলেন, তাহা তিনি করিলেন (অর্থাৎ কচ্ছপ) কূর্ম্ম। এইজন্য লোকে বলে, সকল জীব কশ্যপের বংশ।

অতএব কশ্যপই জনক বা আকাশ। তারপর উপন্যাসকারেরা বাড়াইয়াছে। এক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ, সকল বস্তুরও যে মা বাপ, ইন্দ্রেরও মা বাপ সেই প্রকৃতি পুরুষ! বলা বাহুল্য যে, ইহা সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ নহে।

ইন্দ্র—বস্তুতই কি ইন্দ্র গুরুতল্পগামী ইন্দ্রিয়পরবশ দেবতা! তাহা নহে, তিনি আকাশ। ইন্দ্ ধাতু বর্ষণে, তদুত্তরে 'র' প্রত্যয় করিয়া "ইন্দ্র" শব্দ নিষ্পন্ন হয়। আকাশ বৃষ্টি করে, অতএব ইন্দ্র আকাশ।

সতীশ। ইন্দ্র কি অহল্যা-জার নহেন?

সন্ন্যাসী। না। তেজোময়-সবিতা—ঐশ্বর্য্য হেতুক ইন্দ্র-পদ-বাচ্য। অহন্ অর্থাৎ দিনকে লয় করে বলিয়া রাত্রের নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্র অর্থাৎ সবিতা অহল্যা-জার। ব্যভিচার জন্য নহে।

সতীশ। বুঝিলাম না। কশ্যপ, ইন্দ্র, সবিতা, সবই আকাশ?

সন্ন্যাসী। হাঁ, যখন আকাশকে অনন্ত বলিয়া ভাবি, তখন আকাশ অদিতি যখন আকাশকে বৃষ্টিকারক বলিয়া ভাবি, তখন আকাশ ইন্দ্র, যখন আকাশকে তেজোময় ভাবি, তখন আকাশ সূর্য্য, যখন আকাশকে আলোকময় ভাবি, তখন আকাশ দৌঃ। এমনই আকাশের আরও মূর্ত্তি আছে। স্থূল কথা, ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতা বিশ্বের নানা বিকাশ মাত্র, যথা—আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি, জল, বায়ু ইত্যাদি।

যাহা পূর্ব্বে বলিতেছিলাম, এখন তাহা বিশদ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর—'ব্রহ্মতে সত্ত্ব, রজঃ তম গুণাত্মিকা' যে মায়া আছে, ঐ মায়া হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এই পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে আকাশের সত্ত্বগুণ হইতে ত্বগেন্দ্রিয়, অগ্নির সত্ত্বগুণ হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়, জলের সত্ত্বগুণ হইতে রসনেন্দ্রিয়, পৃথিবীর সত্ত্বগুণ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইয়াছে।

উক্ত পঞ্চতত্ত্বের সমষ্টি সত্ত্বগুণাংশ দ্বারা অন্তঃকরণ হয়, আবার অন্তঃকরণের বৃত্তিভেদে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিপ্রকার হইয়াছে। ঐ পঞ্চতত্ত্বের সত্ত্বগুণ-ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্-পৃথক্ গুণ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইয়াছে, এবং সমষ্টি হইয়া অন্তঃকরণ হইয়াছে।

এই পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে আকাশের রজোগুণ হইতে বাক্, বায়ুর রজোগুণ হইতে হস্ত, অগ্নির রজোগুণ হইতে পাদ, জলের রজগুণ হইতে গুহ্য, পৃথিবীর রজোগুণ হইতে লিঙ্গ-ইন্দ্রিয় উৎপত্তি হইয়াছে।

উক্ত পঞ্চতত্ত্বের রাজসাংশ হইতে পঞ্চপ্রাণ, অর্থাৎ প্রাণ আপন, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ বায়ু হইয়াছে।

ঐ পঞ্চতত্ত্বের রজোগুণাংশ-ব্যষ্টি হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং সমষ্টি হইতে পঞ্চপ্রাণ হইয়াছে।

ঐ সমস্ত পঞ্চতত্ত্বের তামসাংশের পঞ্চ-মহাভূত মিলিত হইয়া পঞ্চীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ তামসাংশের দ্বারা পাঁচ মিলিত হইয়াছে।

এই প্রকার উক্ত পঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে এই স্থূল শরীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং যে প্রকার এই শরীর হইয়াছে, ঐরূপ ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হইয়াছে। এই শরীরের অভিমানী আত্মাকে জীব বলিয়া থাকে।

এখন দেখ, সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করিতে শিখা অর্থাৎ জাগ্রতে, স্বপ্নাবস্থায় থাকিয়া বিচার শক্তি প্রবদ্ধ রাখিতে শিখা, ঈশ্বরোপাসনার প্রথম সোপান। এই অবস্থায় যে সকল পদার্থের সম্পর্কে আসিতে হয়, তাহারাই শবাকার দেবদেবী। সুতরাং দেবদেবীতে

আপন হারান যদিও সাধকের পক্ষে হানিজনক, কিন্তু দেবদেবীর সাক্ষাৎ লাভ করিতে যাওয়া অর্থাৎ আত্মাদের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম শক্তিতে জাগ্রত করা এবং তাঁহাদের সম্পর্কজনিত সুখে বিতৃষ্ণ হইয়া তত্ত্বম আলোচনা দ্বারা আরও উচ্চে আরোহণ চেষ্টা করাই ঈশ্বরোপাসনার সোপান। সাকারের আরাধনা ব্যতীত নিরাকারের উপাসনা হয় না।

এক্ষণে উপস্থিত বিপদের বিষয় কি—তাহাই বল।

সতীশ বলিলেন, "দেব! সে কথা বলিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়। কাজী সাহেব বিচার করিয়া হুকুম দিয়াছে, দাসী ছদ্মবেশে আসিয়া নূতন বেগমকে বাহির করিয়া দিয়াছে, অতএব উহাকে শূলে দিতে হইবে। বিদ্রোহী বলিয়া যে সকল হিন্দুদিগকে ধরিয়া ফটকে পুরিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে একে একে বাহির করিয়া দাসীর হত্যাকাণ্ডের অনুমোদন করিতে বলা হইবে। যাঁহারা নির্দোষী, অবশ্য তাহারা অনুমোদন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, তাহাদিগকে এক্ শত মুদ্রা করিয়া জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। যাহারা টাকা দিতে অপারগ বা অস্বীকৃত হইবে, তাহাদিগকে একবৎসর রাজকীয় কর্ম্ম বিনাবেতনে করিতে হইবে, আর যাহারা হত্যাকাণ্ডের সহায়তা না করিবে, তাহারা অবশ্য ষড়যন্ত্রকারী দোষী, তাহাদিগকেও শূলে দিতে হইবে। এই পৈশাচিক ক্রিয়া আগামী কল্য সমাধা হইবে। এক্ষণে দেব! এই পাশব ক্রিয়া যাহাতে সম্পন্ন হইতে না পারে, তাহার বিহিত বিধান করুন।"

সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ নয়নযুগল মুদিত করিয়া নিঃশব্দে থাকিলেন, শেষে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দেবীকে প্রণাম করিয়া সতীশ-

চন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি বনদেবীকে লইয়া ভৈরবাশ্রমে যাও, আমি একটু স্থানান্তরে যাইব।"

সতীশ ও বনদেবী উঠিয়া গেলেন। সন্ন্যাসীও গৃহের অর্গল-বদ্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

---

(১৫)

সন্ধ্যাব সময় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর ঃ সন্ধ্যারতি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া সতীশ ও বনদেবীকে নিকটে বসাইয়া ভৈরবাচার্য্য কহিলেন "হিন্দুদিগের মধ্যে সাকারোপাসনা প্রচলিত আছে কেন, বলিতেছি শ্রবণ কর ;—

প্রথমে দেখা যাউক, উপাসনা কাহাকে বলে। জগতের আদি কারণ এক এবং অদ্বিতীয় ইহা বিশ্বাস করিয়া আগ্রহচিত্তে সেই কারণের স্বরূপ কি, ইহা বুঝিতে চেষ্টা করার নাম ঈশ্বরোপাসনা, কিন্তু মনের এই আগ্রহচিত্ত শুদ্ধি ব্যতীত সম্ভবে না। যাহার চিত্ত যত বিশুদ্ধ হইতে থাকে, তিনি সেই পরিমাণে সেই আদি কারণের স্বরূপ জানিতে সক্ষম হয়েন। দেবাদি পূজার মূল সূত্র এই যে, "ন দেবা দেব মর্চ্চয়েৎ।" দেবভাবাপন্ন না হইলে দেব-পূজার অধিকারী হয় না। যেরূপ ভাবাপন্ন হইয়া পূজা করিবে, সেইরূপ ভাবানুযায়ী দেবতার সম্পর্কে আসিতে পারিবে। সূক্ষ্ম-শক্তির আধার সকল প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত। পিতৃলোকে, দেবলোকে ও ঋষিলোকে। শ্রদ্ধাদ্বারা পিতৃলোককে সন্তুষ্ট করিতে হয়, কর্ম্ম—অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি চালনা দ্বারা ঋষিলোকের সম্পর্কে

আসা যায় এবং জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা ঋষিলোকের সম্পর্কে উপনীত হওয়া যায়। যে পূজা প্রেম-প্রধান তাহা পিতৃলোকের, যে পূজায় ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্য তাহা দেবপূজা এবং যে পূজায় জ্ঞান-শক্তির প্রাধান্য তাহা ঋষিপূজা। আর যে পূজার উদ্দেশ্য পিতৃ-ঋণ, দেবঋণ ও ঋষিঋণ পরিশোধ করা, তাহাই ঈশ্বরোপাসনা। নিষ্কাম প্রেম চর্চ্চার দ্বারা পিতৃঋণ শোধ দিতে হয়, নিষ্কাম কর্ম্ম-দ্বারা দেবঋণ পরিশোধ হয় এবং আত্মজ্ঞান চর্চ্চাদ্বারা ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে যে পূজায় পিতৃচক্র, দেবচক্র এবং ঋষিচক্র হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম ঈশ্বরোপাসনা। দেবভাবাপন্ন ব্যক্তি দেবপূজার অধিকারী এবং ঈশ্বর ভাবাপন্ন ব্যক্তিই ঈশ্বরোপাসনা করিতে জানেন। ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে যদি জানিতে চাও, তবে চিত্ত শুদ্ধি কর।

সতীশ। আপনার কথাতে বুঝা যাইতেছে, ঈশ্বর এক। তবে দুর্গা, শিব, গণেশ, বিষ্ণু, লক্ষ্মী প্রভৃতি বহু পূজা কেন?

ভৈরব। হাঁ, যে এক এবং অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী পদার্থ, তাহারই নাম ঈশ্বর। দুর্গা, শিব, গণেশ, বিষ্ণু প্রভৃতি এক একটা সংজ্ঞা। গুণভেদে গুণময় ঈশ্বর সাকার— সেই অচিন্ত্য ব্যক্তিরূপ জগদীশ্বর অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় নিমিত্ত নানাবয়বে অবতীর্ণ হইয়া কখন প্রকৃতি, কখন কুমারী, কখন চতুরানন, কখন পঞ্চানন, কখন ষড়ানন, কখন গজানন হইয়াছেন। নানা শাস্ত্রেই শিব, শক্তি, সূর্য্য, গণপতি ও বিষ্ণু প্রভৃতির এক ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব অভিন্ন ভাবে ঐ সকল দেবতার মধ্যে যে কোন দেবতারই রূপ লইয়া এবং তাঁহাকে আদর্শ করিয়া জগদী-শ্বরের স্বরূপ জানিবার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে জ্ঞান-লালসা

বৃত্তিবশতঃ সাধক যখন সেই জগৎ-কারণ-তত্ত্ব অন্বেষী হন, তখনই তিনি ঈশ্বরোপাসক। অর্থাৎ আগ্রহ চিত্তে সেই আদি কারণের স্বরূপ জানিবার চেষ্টাই তাঁহার উপাসনা। তবে যাহারা—কালী মারিভয় হইতে রক্ষা করেন—শিব অভিষ্ট ফল প্রদান করেন—নারায়ণের তুলসী দিলে মোকদ্দমা জেতা যায়—ইহা ভাবিয়া পূজা করেন, তাঁহারা ঐ সকল দেবতারই পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে, নিশ্চয়ই ঈশ্বরোপাসনা করিলেন,এ কথা বলিতে পারি না।

আবার ঈশ্বর দয়াময় ইহা ভাবিয়া স্বার্থসিদ্ধি। কামনায় তাঁহাকে অতি ভক্তিভাবে ডাকিলেও ঈশ্বরোপাসনা হইল না। কারণ, যদি ঈশ্বর-তত্ত্ব জ্ঞান-লালসা অন্তরে না থাকে, তবে কি সাকার কি নিরাকার কোন উপাসনাই ঈশ্বরোপাসনা নহে। ভক্তি বৃত্তির চর্চ্চায় মানসিক উপকার যাহা হইবার সম্ভাবনা, এই উপাসক সেই উপকার প্রাপ্ত হইবেন। ফলে ইহার অধিক আর কিছুই নহে। সাকার উপাসনায় কালী, দুর্গা, শিব, সূর্য্য, নারায়ণ, শিলা, ঘট, পট প্রভৃতি যাহাই উপলক্ষ করিয়া জগৎ কারণ সেই অনাদি পুরুষ সম্বন্ধে চিন্তা করা—ঐ পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকলে ঈশ্বরের যে মহিমা বিরাজমান রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যে ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞানের উপায়, ইহা বুঝিয়া সেই বিষয়ের তথ্যানুসন্ধায়ী হইয়া এবং সেই মহিমা-মাহাত্ম্যে ভাবগ্রাহী হইয়া ঐ সাকার পদার্থদিকেই ভক্তিভাবে যদি পূজাদি করি, তাহাই ঈশ্বরোপাসনা। দেবতা শুভফল প্রদান করিবেন, এরূপ ভাবিয়া যদি প্রতিমাদি পূজা করা যায়, তবে তাহা দেবদেবীরই আরাধনা —ঈশ্বরোপাসনা নহে। আর যদি ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের পথ বুঝিয়া প্রতিমা পূজা করা হয়, তাহা ঈশ্বরোপাসনা। কেন না

ইহাকে সাকার উপাসনা বলিতে হইবে বটে, কিন্তু সাকারের সাহায্যে অনাদি কারণতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে অগ্রসর হইবার চেষ্টামাত্র।

সতীশ। আপনি যেরূপ প্রতিমা পূজা-পদ্ধতি বলিলেন, শাস্ত্রীয় পূজা পদ্ধতিতে কিন্তু তাহা হয় না। বিবেচনা করুন, আমি ব্রাহ্মণ; আমার পক্ষে শিবপূজা, নারায়ণ পূজা নিত্যকর্ম—আবার তাঁহাদিগের পূজার আগে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সূর্য্য, গণেশ, নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল প্রভৃতি পূজা করিতে হইবে—কেহ বা রক্তবর্ণ, কেহ বা শ্বেতবর্ণ, কেহ বা কালো, কাহারো বা পাঁচমুখ কাহারও বা হাতীর মত মুখ, কেহ বা রোগ-শোক নিবারণ করেন, কেহ বা দুঃস্বপ্ন দুঃখাদি দূর করেন, কেহ বা শত্রুভয় বিমোচন করেন ইত্যাদি—এতরূপ চিন্তা, এত জনের উপাসনা, এত কামনা, ইহার মধ্যে একের স্বরূপ চিন্তার প্রতিপাদ্য কি আছে?

ভৈরব। সাধারণ দেবদেবীর আরাধনা করিলে দেবদেবীর-ই আরাধনা করা হয় এবং উহাতে ঈশ্বরে ভক্তি, মনের শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়। যখন ঈশ্বরের দৃঢ়ভক্তি, মনুষ্যের প্রীতি হয়, তখন হিন্দুদিগকে গুরু মানসিক শক্তি, রাশি আদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এক একটি দেবদেবীর উপাসনা করিতে শিক্ষা দিয়া যান। তখন সেই দেবে ভক্তি করিতে হয়, উপাসনা করিতে হয়। এখন দেখ, যাহাকে ভালবাসি না, তাহার অনুসরণে মন যায় না। এই জন্যই হিন্দুঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, কোন একটি উন্নত আদর্শে প্রগাঢ় ভক্তি রাখিয়া সেই আদর্শ সম্বন্ধে অনবরত চিন্তা করিবে। এইরূপ আদর্শ চিন্তাই সাধারণতঃ উপাসনা নামে অভিহিত।

সাকার উপাসনা, হিন্দুগণের দেবদেবী এইরূপ এক একটি আদর্শ মাত্র। আর নিরাকার উপাসকের দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ-বিশিষ্ট ঈশ্বরও এইরূপ একটি আদর্শ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপ সগুণ ঈশ্বর হিন্দুদিগের নিকট একটি দেবতা স্বরূপ। ঈশ্বর নির্গুণ, স্নুতরাং সগুণ উপাস্য আদর্শের ঈশ্বর না বলিয়া দেবতা বলাই সঙ্গত।

বাস্তবিক হিন্দুরা সাকার বা সগুণ দেবদেবীকে কখন আদি কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। ঈশ্বর তাঁহাদের কাছে চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিস্ফল এবং অশরীর। তবে সেই—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যা শরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণঃরূপ কল্পনা॥

সতীশ। এইবার আমার মনে ভারি সন্দেহ হইল—যদি কৃপা করিয়া ভঞ্জন করেন।

ভৈরব। বল।

সতীশ। আপনি বলিলেন দেবদেবী এক একটি আদর্শ। হিন্দু ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন ‘কোন একটা উন্নত আদর্শ সম্বন্ধে অনবরত চিন্তা করিবে।’ বোধ হয় তাহা হইলে সেই আদর্শের ন্যায় চরিত্র গঠিত হইবে, এই উহার উদ্দেশ্য ?”

ভৈরব। সাধারণতঃ তাহাই।

সতীশ। ধরুন, আমি কৃষ্ণভক্ত—

কথা শেষ না হইতেই ভৈরবাচাৰ্য্য হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “বুঝিয়াছি, কৃষ্ণের ঘোলচুরি—মাখন চুরি—বস্ত্রহরণ—মানভঞ্জনের কথা পাড়িতেছ।”

সতীশ। সেটা কি অন্যায় ?

ভৈরব। ও সকল কথা কোন মূল গ্রন্থে নাই। উপন্যাস-কারেরা, বৈষ্ণব কবিরা অতদূর করিয়াছে। তবে যাহা একটু আধটু দেখা যায়—তাহাতে কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ। সে অনেক কথা, বিপদ উদ্ধারের পর যদি সময় থাকে, আর সকলে জীবিত থাকে, বুঝাইতে চেষ্টা করিব। রাত্রি কত?

সতীশ। অনুমান দ্বিপ্রহর।

এমন সময় দূর প্রান্তর হইতে সুগভীর শিঙ্গারব উঠিয়া নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। ভৈরবাচার্য্য কহিলেন, "সতীশ! বাহির হইয়া শুন ত' কিসের শব্দ হইতেছে?"

সতীশ বাহির হইয়া শুনিল। ভৈরবাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া বলিল, "কোথায় শিঙ্গা বাজিতেছে।"

ভৈরবাচার্য্যও একটা শিঙ্গা লইয়া বাহির হইলেন। হস্তস্থিত শিঙ্গাটি গম্ভীর নাদে তিনবার বাজাইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সতীশকে বলিলেন, "চল, সাতুর যাই।"

সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "বনদেবী কোথায় থাকিবে?"

ভৈরব। আমাদের সঙ্গে যাইবে। এখানে ভৈরবভৈরবী কেহই থাকিবে না। সকলেই আমাদের সঙ্গে যাইবে।

সতীশ। তবে তাঁহাদিগকে ডাকান্!

ভৈরব। শিঙ্গারবে সকলেই বাহির হইয়াছে, তুমি চল।

তিনজনে দেবী-পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া বাহির হইলেন। দেবীমন্দির রুদ্ধ হইল।

(১৬)

কাজী সাহেবের ফটক গৃহে প্রায় সাত-আট শত হিন্দু বন্দী রহিয়াছে। তাহারা সকলেই রঙ্গিনী দাসীর বধের কথা শুনিয়াছে। ভুবনও তাহা শুনিয়াছে। কিন্তু নূতন বেগম কে, রঙ্গিনী দাসী কে, সে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তবে এক একবার মনে হইতেছে, গুরুদেব বলিয়াছিলেন, সৈনিকদ্বয় সরোজা ও সতীশচন্দ্র। কাজী সাহেব কি বনদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছিল? কি জানি ভগবান কি খেলা খেলিতেছেন। হা দয়াময়! এসকল বন্দীগণেরই বা উপায় কি? ইহাদিগের দুর্দ্দশা কি দেখিতে পাইতেছেন না? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আবার ভাবিলেন, গুরুদেব বলিয়াছিলেন, আবশ্যক হইলে দেখা পাইবে। কিন্তু কৈ, দেখা ত পাইলাম না? "গুরো! বড় বিপদে পড়িয়াছি—দেখা কি পাব না গো!" শেষ জানুদ্বয় মধ্যে মস্তক গুঁজিয়া গান ধরিলেন—

"সবে মিলে গাও রে এখন, গাও তাঁরে,
গায় যাঁরে নিখিল ভুবন।
বিহঙ্গ কাকলী করে, যাঁর নামে সুধাক্ষরে,
মোহিত গগন গিরি, সুধাংশু তপন।
ছাড়ি মোহ কোলাহল, সে আনন্দধামে চল,
শোন সে আনন্দধ্বনি মুদিয়া নয়ন,
সেই পূর্ণ প্রাণেশ্বরে, জগৎ ভজনা করে,
প্রেম নয়ন মেলি কর দরশন।

অনেকক্ষণ গাহিয়া গাহিয়া গীত সমাপ্ত করিলেন। শেষে নিদ্রা

আসিল। ভুবন ঘরের কোণে মাটির উপর শুইয়া পড়িলেন, সত্বরেই নিদ্রাগত হইলেন।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া শেষরাত্রে ভুবনমোহন এক স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, অন্ধকার-বিপ্লাবিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নীরব—নিস্তব্ধ। কোথাও সাড়া শব্দ কিছুই নাই—ঘোর গম্ভীরতাময়। আকাশে বিরাট ধূমরাশি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই অনন্তবিস্তৃত ধূম-স্তর মণ্ডলে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বৃহৎ স্তম্ভাকার ধারণ করিল। তাহার শিখরদেশ আকাশের প্রান্তে গিয়া সংলগ্ন হইল। সেই অন্তরীক্ষ প্রদেশে ধূমময় স্তম্ভ-শিখরে, ভুবন দেখিলেন, মণিমরকতাদি-মণ্ডিত বিবিধ কারুকার্য্যখচিত এক সিংহাসন—উজ্জ্বল চন্দ্রকর সংস্পর্শে হীরকস্তূপবৎ ঝক্-ঝক্ করিয়া উদ্ভাসিত হইতেছে। ভুবন বিস্ময়-বিহ্বলনেত্রে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। কি অপূর্ব্ব শোভা! অনন্ত নক্ষত্রখচিতবৎ সেই সিংহাসনোপরি কীরিট-কুণ্ডল শোভিত নানালঙ্কার ভূষিত এক জ্যোতির্ম্ময় রাজরাজেশ্বর মূর্ত্তি। বদনমণ্ডলে করুণা উছলিয়া পড়িতেছে—নয়নে স্নেহরাশি স্ফুরিত হইতেছে। ভুবন সবিস্ময়ে, সানন্দে, ভীতহৃদয়ে চিনিলেন—তাহার সেই গুরুদেব এই আলোকময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। ভুবন প্রাণ ভরিয়া, হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া ডাকিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কথা ফুটিল না। ভুবন শতবার চেষ্টা করিলেন—কথা ফুটিল না। তখন তিনি বড়ই কাতর হইলেন। করুণাময় সর্ব্বসন্তাপহারী গুরুর দেখা পাইয়াও ভুবন একবার প্রাণ ভরিয়া গুরু বলিয়া ডাকিতে পারিলেন না, তাঁহার কান্না আসিল, দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। অশ্রুপ্লুত কাতর মুখখানি তুলিয়া ভুবন গুরুদেবের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

তখন নৈশ-গভীরতা বিদীর্ণ করিয়া কিন্নর-কণ্ঠ-গীতিবৎ সহস্র-বীণাঝঙ্কার-নিন্দিত কি এক অপার্থিব স্বরে সেই কিরণময়ালী, কারুণ্য-প্রফুল্লকণ্ঠে কহিলেন, "বৎস, কেন কাঁদিতেছ? দুঃখে পড়িয়াছ বলিয়া কি কাঁদিতে আছে? আমি তোমাকে প্রথম দিনেই বলিয়াছি, যেখানে সুখে দুঃখে প্রভেদ নাই—দুঃখে বিরাগ, সুখে আকাঙ্ক্ষা নাই—সেইখানেই প্রকৃত আনন্দ। তবে তুমি এই সামান্য দুঃখে পড়িয়া কাঁদিতেছ কেন?"

এতক্ষণে ভুবনের কথা ফুটিল। বলিলেন, "দেব, কাঁদিব না! কি হইল? দেশের এ দুর্গতি, এ অরাজকতা, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, নির্ধনীর প্রতি ধনীর আক্রোশ, পীড়িতের প্রতি সুস্থকারীর নিপীড়ন, ধর্ম্মের মূলদেশে কুঠারাঘাত—গুরো! ইহা দেখিয়া কেহ না কাঁদিয়া থাকিতে পারে দেব? দয়াময়, এই ফটকের ভিতর দেখুন দেখি—কি ভয়ানক দৃশ্য! কত গরীব, কত দীন দুঃখী নিরপরাধে ফটকে পচিতেছে। ইহারা দারুণ ক্ষুধায় একমুষ্টি অন্ন পাইতেছে না, প্রাণ-বিয়োগী তৃষ্ণায় এক বিন্দু জল পাইতেছে না। বলপূর্ব্বক রমণীর সতীত্ব হরণেচ্ছা, নারীহত্যা এ সকল কি অত্যাচার! ইহার কি প্রতিবিধান হইবে না?"

গুরু। দুষ্টের দমন আবশ্যক।

ভুবন। দেশে ঘোর অরাজকতা, কাহারো ধন প্রাণ নিরাপদ নহে। দুর্বৃত্ত দস্যুদিগের দৌরাত্ম্যে দেশস্থ সমস্ত লোক যৎপরোনাস্তি নিপীড়িত; এক মুহূর্ত্তের জন্য কেহ নিশ্চিন্ত নয়, কাহারও হৃদয়ে তিলমাত্র সুখ নাই। এরূপ অবস্থায় কাহার না প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে, কে না দুঃখ করিয়া না কাঁদিয়া থাকিতে

পারে দেব! প্রতিদিন রাজা, রাজকীয় লোক, ফকির, চোর, ডাকাইত—আমাদিগকে প্রহার ও পীড়ন করিয়া আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইবে—আমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতাদিগকে যথেচ্ছা প্রহার, কয়েদ ও হত্যা করিবে—আমাদের আবালবৃদ্ধকে অপমান ও নির্য্যাতন করিবে! অধিক কি সতীত্ব-রত্ন হরণ করিতে পামরগণ কুণ্ঠিত হয় না—এই সকল ঘোর অরাজকতা; এই সকল দারুণ অত্যাচার প্রতিদিন ঘটিবে—আর আমরা জড়সড় হইয়া বসিয়া বসিয়া তাহা দেখিব? ভয়ে হস্তোত্তলন করিব না? কেন? প্রাণের এত ভয় কেন? যাহারা আমাদের যথাসর্ব্বস্ব বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছে, তাহারাও মানুষ, আমরাও কি মানুষ নহি? আমরা যদি মানুষ হই, তবে তাহাদিগকে ভয় করিব কেন? মরিতে হয় মরিব, কিন্তু এ দারুণ অত্যাচার কখনই সহ্য করিতে পারিব না। স্বদেশে, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের মঙ্গলের জন্য আত্ম-বলিদান দেওয়ার নামই ত' ভূতলে স্বর্গ দর্শন! সে স্বর্গ দর্শনে আমি কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইব না।

তখন যেন সন্ন্যাসী ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিলেন, "বৎস! দেশে এখন সিরাজের একাধিপত্য, সে নিজে অত্যাচারী, তাহার কর্ম্মচারীগণও অত্যাচারী। রাজা সুবিচারক ও ধর্ম্মনিষ্ঠ না হইলে যাহা ঘটে তাহাই ঘটিতেছে—চোর ডাকাইতে দেশ পূরিয়াছে; কিন্তু বৎস, তুমি একা অথবা দু'শ, পাঁচ'শ লোকের সহায়তায় দেশের মঙ্গলসাধনে ব্রতী হইয়া কি কৃতকার্য্য হইতে পারিবে? দেশশুদ্ধ লোক যদি একমত হয়, তবেই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা।"

ভুবন সবিস্ময়ে কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "তবে কি ইহাদের উদ্ধার হইবে না ?"

তখন সেই দৈবমূর্ত্তি তেজঃপুঞ্জ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একটি মূর্ত্তি দেখাইলেন। ভুবন দেখিলেন, সেও এক সন্ন্যাসী মূর্ত্তি, তাঁহার হস্তে রক্তবর্ণের নিশান—তাহাতে সুবর্ণাক্ষরে কি লেখা!

ইহা দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ভুবনমোহন উর্দ্ধমুখে সেই দৈব-মূর্ত্তির পানে চাহিলেন। যখন চাহিয়া দেখিলেন—তখন সে মূর্ত্তি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছিল, সে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ধীরে ধীরে ধূম-পটলে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। প্রখর সূর্য্যমণ্ডল যেমন মেঘস্তর মধ্যে ধীরে ধীরে আবৃত হয়, তদ্রূপ ক্রমে ক্রমে স-সিংহাসন সে মূর্ত্তিও মেঘস্তর মাঝে ডুবিয়া গেল। ভুবন আবার দেখিলেন, সেই সর্ব্বগ্রাসী বিরাট অন্ধকার—স্তরে স্তরে বিচরণ করিতেছে। ভুবন ডাকিতে গেলেন, "গুরো !" কিন্তু মুখের কথা মুখেই রহিল—বন্দীগণের কোলাহলে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

(১৭)

নিদ্রাভঙ্গে ভুবন চাহিয়া দেখিলেন, তখন প্রভাত হইয়াছে। ফটকের ভিতর বন্দীগণ কলরব করিতেছে। একজন সিপাহী তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া বন্দীগণকে কাজী সাহেবের হুকুম জনাইতেছে, "রঙ্গিণীদাসী নূতন বেগমকে কৌশল করিয়া অন্দর মহল হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে, তাহাকে অন্ত শূলে

দেওয়া হইবে। অবশ্য কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না যে, কতিপয় হিন্দুর যোগেই এ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। সেই সকল হিন্দুগিকে চিনিবার জন্য তোমাদিগকেই আদেশ করা যাইতেছে, তোমরা সকলে হত্যাকাণ্ডে অনুমোদন করিবে! যাহারা ইহাতে অনুমোদন করিবে না, তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদিত হইবে, যেহেতু তাহা হইলে স্পষ্টতই বুঝা যাইবে যে, তাহারা ষড়যন্ত্রকারী। যাহারা শূলে দেওয়ার স্বাপক্ষে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে, তাহারা কেবলমাত্র একশত রৌপ্যমুদ্রা দিলেই খালাস পাইবে। টাকা দিতে অসম্মত হইলে, রাজসরকারে বিনাবেতনে উপযুক্ত ও পারগতা অনুসারে এক বৎসর কাজ করিতে হইবে।"

এই আদেশ শ্রবণ করিয়া ভুবনের মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। প্রাণের ভিতর একটা গুরুতর ভাবের আবির্ভাব হইল, হৃদয়ের ভিতর বৈদ্যুতিক ক্রিয়া সম্পাদন হইয়া গেল। একে স্বপনে অলৌকিক কাণ্ড সন্দর্শন করিয়াছেন, আবার আঁখি কচালিয়া উঠিতেই এ নিদারুণ আদেশ তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তিনি এক মুহূর্ত্তে অবসন্ন ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। কয়দিনের হৃদয়-পোষিত ভয়ের ছায়া আজ যেন তাঁহার সম্মুখে বিরাট-মূর্ত্তিতে পূর্ণরূপে দেখা দিল। ভুবন তখন চক্ষুদ্বয় মুদিত করিলেন। এক মুহূর্ত্তে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সমস্ত তাঁহার মনে পড়িল—বিগত রজনীর স্বপ্ন, গুরুর আদেশ সকলই মনে পড়িল, তাহাদিগের উদ্ধারের উপায় **শক্তি-সাধনা**।

এই সময় একজন ফকির ফটকগৃহে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে কাহার অনুসন্ধান করিলেন, শেষে ভুবন যেখানে

পড়িয়াছিল, সেইস্থানে গিয়া বসিলেন। ভুবনের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া ধীরে-ধীরে বলিলেন, "উঠ বৎস! এ ঘোর বিপদের সময় কি শুধু কাঁদিলে চলিবে? উঠ, হৃদয় দৃঢ় কর, বুদ্ধির কৌশল জাল বিস্তার কর,—আর প্রাণ ভরিয়া সর্ব্ববিপদহারী হরিনাম কর।"

ভুবন চক্ষু খুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন; তাহার সম্মুখে একজন মুসলমান ফকির! বলিলেন, "মহাশয়, আপনি মুসলমান ফকির; আপনি হিন্দুর পক্ষাবলম্বন কিজন্য করিতেছেন?

ফকির। সে কথা পরে বলিলে হয় না কি? এদিকে এই সকল বন্দীগণের জীবন বিনাশ ও রঙ্গিণীদাসীর শূলের সময় আর অধিক কাল বিলম্ব নাই। বেলা প্রায় চারিদণ্ড হইয়াছে; দ্বিপ্রহরের পরেই এই পৈশাচিক ক্রিয়া সম্পাদন হইবে। আমি যদি তোমাদিগের উদ্ধারের কোন কৌশল বলিয়া দিতে পারি, তাহা শ্রবণ করা কি তোমার উচিত নহে?

ভুবন। কিছু না। আপনাকে বিশ্বাস কি?

ফকির। অবিশ্বাসের কারণই বা কি?

ভুবন। আছে। আপনি মুসলমান, আমরা হিন্দু। আমাদিগের জন্য আপনার এমন কি মাথাব্যথা পড়িয়াছে যে, আপনি এত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। বরং আপনি মুসলমান হইয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন, এ জন্য আপনাকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতে পারি।

ফকির হাসিয়া বলিলেন, "ছিঃ বৎস, তোমার মুখে ওরূপ কথা সাজে না। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ ইহারা সকলেই কি এক মায়ের সন্তান নহে? সকলের জন্যই

কি একরূপ পরকাল, একরূপ স্বর্গ, নরক, একরূপ কর্মফল নির্দ্দিষ্ট নাই? বল দেখি বৎস, ধর্ম্মের খোসাভূষী বাদ দিলে ইহাদিগের সকলেরই ধর্ম্ম কি একরূপ নহে? জাতী লইয়া স্বর্গ বা নরক নির্দ্দিষ্ট হয় না। তবে হিন্দুর মধ্যেও যাহারা অধর্ম্মী, পরানিষ্ট-কারী, তাহার শাসন আবশ্যক। মুসলমান বা অন্যান্য জাতির মধ্যে হইলেও শাসন আবশ্যক। এখন ভারতে মুসলমান রাজা, সেই রাজা অত্যাচারী, অবিচারী, পরস্বাপহারী—কাজেই তাহার শাসন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের উজ্জ্বল অক্ষরে-অক্ষরে দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে মোগল-কুলতিলক আকবর সাহের রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলমান মধ্যে বিদ্বেষভাব ছিল না। হিন্দু-মুসলমান এক হইয়া একতানে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনিতে প্রকৃতিকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। যাহা হউক, যদি আমাকে বিশ্বাস কর, তবে আমি তোমাকে কয়টি কথা বলিয়া যাই, শ্রবণ কর।"

ভুবন এতক্ষণ স্থির-নেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়াছিলেন, চাহিয়াই চিনিলেন,—ফকির তাহার স্বপ্নদৃষ্ট নিশান হস্তে সন্ন্যাসীর পুলকিত হৃদয়ে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "আজ্ঞা করুন।"

ফকির চুপে চুপে ভুবনকে কি বলিয়া উঠিয়া ফটকের বাহির হইয়া গেলেন। তখন ফটকের দ্বার রুদ্ধ হইল।

পাঠক ছদ্মবেশী ফকিরকে চিনিয়াছেন কি? ইনি স্বয়ং ভৈরবাচার্য্য।

(১৮)

কাজী সাহেবের ফটক-বাড়ীর দক্ষিণে প্রকাণ্ড এক মস্‌জিদ। শুনা যায় ইহা মুসলমানদিগের কোন পীরের মস্‌জিদ। কাজীর হুকুমে কাহারও প্রাণদণ্ড হইলে তাহা এই মস্‌জিদের নিকটেই সমাধিত হইত। এই পীর-মস্‌জিদ্ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। অদ্যাপিও পৌষ সংক্রান্তিতে সেখানে একটি মেলা হয় এবং বহুদূর দূরান্তর হইতে মুসলমান যাত্রীগণ সেখানে সমাগত হইয়া থাকে।

বৈকালের রোদ পড়িয়া আসিয়াছে—অনুমান এক প্রহর বেলা আছে। এই সময় মস্‌জিদের নিকট হিন্দু, মুসলমান, বৃদ্ধ যুবক, বালক,—অগণ্য লোক আসিয়া জমা হইতে লাগিল। রঙ্গিণীদাসীকে শূলে দেওয়া হইবে, তাহা দেখিবার আশাই সকলের আশা।

এদিকে কাজী সাহেবের বাটী হইতে প্রায় পঞ্চাশজন ঢাল, শড়কী-আঁটা সিপাহী ও প্রায় ত্রিশ জন লাল পাগড়ী-আঁটা পাইক সমভিব্যাহারে একখানি শকট সেই মন্দিরাভিমুখে ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল।

শকট দেখিবামাত্র অগণ্য দর্শকবৃন্দ ভারি গোলযোগ আরম্ভ করিল। ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়িতে মস্‌জিদ্ নিকটস্থ যত্নরোপিত ফুলের চারা, ফুলের গাছ সব চরণভরে পেষিত হইতে লাগিল। শকটে সুন্দরী সরোজার দেবীমূর্ত্তি! রাস্তার নীচ স্ত্রীলোকগুলা তাহাকে গালি দিতেছে। কিন্তু তিনি চতুর্দ্দিকের অপমান-সূচক

শব্দে কর্ণপাত না করিয়া প্রশান্তভাবে মুদিতনেত্রে শকটোপরি বসিয়া জগদীশ্বরের জগজ্জ্যোতির চিন্তা করিতেছেন।

আকাশ সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইল। মহাঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত। বিদ্যুৎ ঝলসিতে লাগিল, মেঘ গর্জ্জিতে লাগিল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তথাচ অগণ্য দর্শকবৃন্দ যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিল। বধ্যাসুন্দরীকে লইয়া শকট ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ইতি মধ্যে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। রমণীর বসন ভিজিয়া গাত্রে ঘনিষ্ঠ সংলগ্ন হইয়াছে। ললিতদেহের লাবণ্যময় সুগঠন-লহরী দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অস্তোন্মুখ রক্তিম-রবির লোহিত কিরণ মস্তকে নিপতিত হইয়াছে। বদনের সুন্দরবর্ণ—আরও উজ্জ্বল, আরও সুন্দর হইয়াছে। সমুদয় মূর্ত্তিতে কি এক অনির্ব্বচনীয় মধুরতা ক্ষরিত হইতেছে। মরি রে! এত সৌন্দর্য্য মাধুরী বিকীর্ণ করিতে করিতে—সোনার প্রতিমা তুমি—নবীন বয়সে অদ্য কোথা যাইতেছ? ঐ যে তোমার কোমল-করপল্লব—কোন্ নিষ্ঠুর, নির্ম্মম পামর কঠিন রজ্জুর দ্বারা পৃষ্ঠদেশে কসিয়া বন্ধন করিয়াছে। তোমাকে কি শূলে দিতে লইয়া যাইতেছে? অথবা তোমাকে কেহ লইয়া যাইতেছেন? তুমি নারী-শোণিতে নরদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য নিজের ছিন্ন-মস্তকের দ্বারা অত্যাচারের শিরশ্ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে, নিজের দেশের মঙ্গল-কামনায় আপনাকে আপনি বলিদান দিতে যাইতেছ! ধন্য নারী-জীবন!

শকট আসিয়া মসজিদের নিকট দাঁড়াইল। রঙ্গিণী শকট হইতে অবরোহণ করিলেন। অম্লানবদনে বধ-মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে ফটকগৃহের দ্বার হইতে আর যে বধমঞ্চের নিকট রঙ্গিণী দাঁড়াইয়া আছে, সেই পর্য্যন্ত—দুইধারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সিপাহী দাঁড়াইল, সকলেরই হাতে ঢাল শড়্‌কী—দুই শ্রেণীর মধ্য দিয়া প্রশস্ত রাস্তা থাকিল। সেই সকল সিপাহীর পশ্চাতে আসিয়া অনেক লোক জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইল। দুইজন সাহসী মুসলমান সৈনিক ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। একজন বন্দীকে লইয়া বাহিরে আসিল। ফটকের দরজা অনাবদ্ধ থাকিল।

ভুবন ফটকের মধ্য হইতে সুগভীর ও উদ্দীপন স্বরে বন্দী-গণকে কহিলেন, "তোমাদিগকে এতক্ষণ যাহা বুঝাইয়াছি, যাহা শিখাইয়াছি, এই তাহার সময়। বল—"জয় কালী মায়ীকি জয়!" সেই সমবেত বন্দীর কণ্ঠভেদী ঐক্যতানিত স্বর উঠিল, "জয়, কালী মায়ীকি জয়!" বাহিরের দর্শকেরা সাশ্চর্য্যে সে রব শুনিল। শুনিতে শুনিতে তাহারা দেখিল, অনন্ত স্রোতস্বিনী —বাঁধ ভাঙ্গা অনন্ত জলপ্রপাত রাশির ন্যায় "জয় কালী মায়ীকি জয়" রব করিতে করিতে বন্দীগণ বাহির হইয়া পড়িল। বাহি-রের সিপাহীরা রুখিল—কিন্তু পশ্চাদ্ভাগের দণ্ডায়মান দর্শকেরা লাঠী হাঁকাইতে আরম্ভ করিল। সিপাহীরা আত্ম-রক্ষায় ব্যতি-ব্যস্ত ও শ্রেণী-বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং পশ্চাদ্ভাগের লোকদিগের সহিত যুঝিতে লাগিল। বন্দীগণ এই অবসরে বিনাক্লেশে বাহির হইয়া পড়িল। যেখানে রঙ্গিণী-বন্দিনী সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া-ছিল, সেখানে অনেকক্ষণ হইতে একজন ছদ্মবেশী পুরুষ দাঁড়াইয়া-ছিলেন, তিনি এই গোলযোগের সময় রঙ্গিণীকে লইয়া তীরবেগে প্রস্থান করিলেন।

(১৯)

একজন পাইক ছুটিয়া আসিয়া কাজী সাহেবকে এ সংবাদ প্রদান করিল। কাজী সাহেব অতি সত্বর সেনাপতিকে সংবাদ দিলেন। সেনাপতি—কামান, বন্দুক, গোলা গুলি প্রভৃতি যুদ্ধোপযুক্ত অস্ত্র-শস্ত্রাদি লইয়া সসৈন্যে ধাবিত হইলেন।

সেনাপতি যখন রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন সেখানে এক অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য আবির্ভূত। সম্মুখেই বনদেবী। বনদেবীর ভৈরবীর বেশ, পরিধান গৈরিক-মৃৎরঞ্জিত বসন, কাঁচলি আঁটা—তাহাও গৈরিক মৃৎরঞ্জিত। আলুলায়িত কেশরাশি বায়ুভরে উড়িতেছে, দর্পিত-পদযুগল অশ্বপোরি দুলিতেছে। গলায় ফুলের মালা, হাতে শাণিত কৃপাণ। এক তেজবতী অশ্বিনী পৃষ্ঠে উপবিষ্টা; যেন দনুজদলনী দুর্গা দেবদল রক্ষার্থে কোন দৈত্য-দলনে সমাগত হইয়া—তাহার আগমন প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিতেছেন। তাঁহার নিকট আরও প্রায় দুইশত অশ্বারোহিণী অস্ত্রধারিণী ভৈরবী অবস্থিতা। আর তাঁহার আশে পাশে, চারিদিকে যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত ভৈরব, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ হিন্দু—প্রায় দুই হাজারেরও অধিক—কামান, বন্দুক লাঠি শড়্‌কী লইয়া উপস্থিত। সেই সঙ্গে শক্তি-সাধক ভৈরবাচার্য্য, বীরাবতার সতীশচন্দ্র, নিষ্কামকর্ম্মী ভুবনমোহন সকলেই আছেন। সরোজাও প্রিয়সখীসহ সমরক্ষেত্রে উপস্থিত। আর সেই যুবক—যাহার স্ত্রীর পীড়ার সময় ভুবন সহায়তা করিয়াছিলেন, যাহাকে সতীশ যাত্রাকালে বলিয়াছিলেন, হিন্দু মুসলমানের মহাসমরক্ষেত্রে

দেখা হইবে—সেও যুদ্ধ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া অনেকের মনে জাতীয় জীবনের বীজবপন করিয়া অনেককে সঙ্গে লইয়া আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বন্দী হিন্দুগণও উপস্থিত। এ দৃশ্য দেখিয়া সেনাপতির হৃদয় একটু কাঁপিল—আরও সৈন্য লইয়া স্বয়ং কাজী সাহেবকে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে সংবাদ পাঠাইয়া তিনি তৎপ্রতীক্ষায় রহিলেন।

সেনাপতির সমাগমে হিন্দুগণ জাতীয়-জীবনে উৎফুল্ল ও ধর্ম্মে অণুপ্রাণিত হইয়া একতানে এক উদ্দেশ্যে রব ছাড়িল—

জয় জয় কালিকে, কালভয় হারিকে,
দুষ্টজন নাশিকে, সুরেন্দ্র পালিকে—

মা!

সহসা বন্দুকের শব্দ হইল। হিন্দুগণ চাহিয়া দেখিল, কাজী সাহেব, তাহার পুত্র ও অন্যান্য পারিষদবর্গ এবং বহুতর সৈন্য আসিয়া জুটিয়াছে। তাহারাই বন্দুকে আওয়াজ করিল। হিন্দুগণও 'জয় মা' বলিয়া বন্দুকে লক্ষ্য করিল—সে লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না। কাজী সাহেবের পুত্রের পাদদ্বয় উড়াইয়া লইয়া হিন্দুর হাতের তেজ দেখাইল।

ক্রমে একটা ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অশ্বের হ্রেষারব হস্তীর বৃংহতী, সৈন্যগণের সিংহনাদ, বন্দুক কামানের নির্ঘোষ, আহতগণের চীৎকার রণভূমিতে এক মহা ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অভিনয় করিতে লাগিল।

এদিকে দিনমণি অস্তাচল গুহাশ্রয়ী হইলেন। সন্ধ্যাসতী সে দিবস যেন যুদ্ধ ব্যাপার দর্শন করিয়াই ঘোর মলিন হইলেন।

ক্রমে রাত্রি প্রহর বাড়িল। আকাশে চাঁদ উঠিল, তথাপিও হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধের বিরাম নাই। রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হইলে অবশ্য নিশা-সমাগমে বন্ধ হইয়া যাইত কিন্তু এ সেরূপ যুদ্ধ নহে। একপক্ষ বিতাড়িত ও অপর পক্ষ শাসনক্ষমতা প্রাপ্ত। সুতরাং একদলের পতন ভিন্ন এ সমরানল নির্ব্বাণের উপায় নাই। কাজেই যুদ্ধ ও বিরামপ্রাপ্ত হইতেছে না, অনবরত অস্ত্রের ঝঞ্ঝাঘাত হইতেছে; অনবরত কামান-বন্দুক সধূম-অনল ও গোলাগুলি উদ্গীরণ করিতেছে। হিন্দু মুসলমান বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় অনবরত ভূপতিত হইতেছে। উভয় দলই মহা সন্ত্রাসিত, বিজয় লক্ষ্মী যে কাহাকে কোলে স্থান দিবেন, তাহা কোন দলেই ভাবিতে অবসর পাইতেছে না।

এই সময় সতীশচন্দ্র কাজী সাহেবকে লক্ষ্য করিলেন। দারুণ আঘাত প্রাপ্তে কাজী সাহেব পঞ্চত্ব পাইলেন। সতীশ তখন বীরমদমত্ততা প্রযুক্ত দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইলেন, বন্দুক ফেলিয়া দৃঢ়কায় করাল তরবাল গ্রহণ করিয়া মুসমান ব্যূহমধ্যে যাইতে সুশিক্ষিত অশ্বকে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিলেন। রণোন্মত্ত তেজবান্ অশ্ব চরণভরে বিপক্ষসৈন্য নিষ্পেষিত করিয়া ব্যূহ প্রবেশ করিল। ভুবনমোহন, বনদেবী, সরোজা এবং প্রায় চল্লিশজন অশ্বারোহী সেনা সতীশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যূহ প্রবিষ্ট হইলেন।

ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সতীশচন্দ্র ও তাহার সখীগণ এমন সুকৌশলে এবং ভীম-বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই মুসলমান সৈন্য ধ্বংসাবশেষে পর্য্যবেষিত করিয়া ফেলিলেন। তখন আর উপায় নাই দেখিয়া সেনাপতি পলায়ন মানসে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। বনদেবী তাহা দেখিয়া তাঁহাকে আক্রমণ

করিল, উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু সেনাপতির সে ভীমবেগ—বনদেবীর কোমল-কর-ধৃত করাল কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে? সেনাপতির তরবারি আঘাতে বনদেবীর তরবারী হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া খসিয়া পড়িল। বনদেবী পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন, নির্ম্মম সেনাপতি তখন দেববাঞ্ছিত পৃষ্ঠদেশে বড় কঠিন শড়্‌কী নিক্ষেপ করিল—সে শড়্‌কী বনদেবীর পৃষ্ঠে বিদ্ধ হইল—সরোজা দূর হইতে তাহা দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া বনদেবীকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ভুবন তাহা দেখিলেন, দৌড়িয়া আসিয়া সেনাপতিকে আক্রমণ করিলেন। দুজনে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিন্তু ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ ভুবনের তেজ সেনাপতি অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না, সুদারুণ আঘাতপ্রাপ্তে সে হস্তপদাদি বিচ্ছিন্ন ও ভূপতিত হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

অবসর পাইয়া হিন্দুগণ চাহিয়া দেখিল, রণভূমি সশস্ত্র মুসলমান শূন্য হইয়াছে। তখন সকলে একত্রীভূত হইয়া সমস্বরে রব ছাড়িল,

জয় কালীমায়ী কি জয়!

মুসলমান প্রায় নির্ম্মূল ও পলায়নপর হইয়াছে। হিন্দুর মধ্যে একশত হত ও প্রায় দুইশত আহত হইয়াছে। কে কে নিহত ও আহত হইয়াছে, দেখিবার জন্য সতীশ ও ভুবন জ্যোৎস্নালোকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, অনেকেই মাতৃভূমির জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া সতীশ ও ভুবন অশ্রুজল পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, সার্থক জীবন তোমাদের! শেষে শবরাশির মধ্যে হইতে আহত ব্যক্তিগণকে বাহির করিয়া উভয়ে স্কন্ধে করিয়া আনিয়া একটা স্থানে রাখিলেন এবং কয়েক-

জনকে তাহাদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া আবার অনুসন্ধানার্থে বহির্গত হইলেন।

বিশেষানুসন্ধানের কারণ, তাঁহারা ভৈরবাচার্য্য, বনদেবী ও সরোজাকে পাইতেছিলেন না। অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটা অশ্বত্থতরুতলে দুইটি মানুষ বসিয়া রহিয়াছে। সেখানে গিয়া দেখিলেন, সরোজা বসিয়া-বসিয়া কাঁদিতেছে, আর একজন অপরিচিতা, সরোজাকে বিবিধ প্রকার সান্ত্বনাবাক্যে বুঝাইতেছে।

"সরোজা কাঁদিতেছ কেন? ভুবন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সরোজা আরও কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিল, সতীশ ও ভুবন তাহা শুনিলেন, তাঁহাদের হৃদয়মাঝারে কে যেন গাঢ় কালিমারাশি ঢালিয়া দিল, প্রাণ মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। যে বীরযুগলের হৃদয় বিষম শত্রুর অসীম অস্ত্র প্রহারেও অবসন্ন হয় নাই, অগণিত নর-শোণিত দর্শনেও টলে নাই, দারুণ দুঃখভাবেও গলে নাই, তাহা সহসা একেবারে ভগ্ন হইল। তাহারা শুনিল—সরোজা বলিতেছে, "প্রাণসখী বনদেবী, আমাদিগকে ফাঁকি দিয়াছে গো! দারুণ আঘাতে সখী ক্লিষ্টা হইলে আমি তাঁহাকে লইয়া এই গাছতলায় আসিয়া তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলাম, কিন্তু সখীর পৃষ্ঠদেশ দিয়া রক্ত প্রবাহ এত খরবেগে বহিতে লাগিল যে, অতি অল্পক্ষণ মধ্যে সখী আমার জ্ঞানশূন্য ও স্পন্দনরহিতা হইয়া উঠিল। আর জল-পানজন্য বারে বারে মুখ প্রসারণ করিতে লাগিল। আমি জল আনিতে যাইলাম, জল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া আর সখীকে দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয় শৃগাল কুকুরে—শব বোধে

আমার সখীকে লইয়া গিয়াছে গো! চারিদিকে অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু সে সোণার প্রতিমাকে আর কোথাও পাইলাম না। কি হলো গো! সাগর বন্ধনই সার হ'ল, সীতা উদ্ধার হ'লো না।"

তখন সতীশ ও ভুবন চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও সন্ধান না পাইয়া অনেকক্ষণ পরে বৃক্ষতলে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই দেখেন, ভৈরবাচার্য্যের মৃতদেহ সেই বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছে। সরোজাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "আমি যখন প্রথমে সখীকে লইয়া এখানে আসিয়াছিলাম, তখনই ঐ শবটিকে ঐখানে পড়িয়া থাকিতে দিয়াছি। সতীশ সে শবের নিকট গিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল—শেষে কাঁদিয়া বলিল, "হায়! আমরা কি করিয়াছি?"

পরিশেষে চক্ষুর জল মুছিয়া ভুবন, সতীশ, সরোজা ও অপরিচিতা যুবতী এই চারিজনে যুদ্ধভূমিতে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া দেখেন, তথায় একটী মনুষ্যও নাই, শবরাশি স্তূপে স্তূপে পড়িয়া আছে। শবভুক্ শৃগাল কুকুরের দল দারুণ কোলাহল করিতেছে। সে স্থান হইতে ফিরিয়া উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয়ে চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে সকলে উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন।

ইতি প্রথম খণ্ড

বনদেবী।

দ্বিতীয় খণ্ড

(১)

সোদপুরের জমিদার যদুনাথ রায় বনদেবী হরণের এক সপ্তাহ মধ্যে বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন এবং তদীয় পত্নী তাঁহার সহমৃতা হইয়াছেন। এখন সে জমিদারীর ও সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী সতীশচন্দ্র। যুদ্ধব্যাপার সমাপ্ত করিয়া সতীশচন্দ্র সোদপুরে আসিয়া সে সমস্ত অধিকার করিয়াছেন। সরোজা এখন সতীশের পরিণীতা পত্নী হইয়া তদীয় হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। ভুবনমোহনও সে বাড়ীতে আছেন; এজগতে আর তাঁহার আত্ম-সম্পর্কীয় কেহ নাই, তবে তিনি আত্মপ্রকৃত গুণে পরের আপন, দূরের নিকট। সতীশ ও সরোজা ভুবনকে ভ্রাতার মত ভালবাসে, পিতার মত ভক্তি করে, বন্ধুর ন্যায় আদর ও সহচরের ন্যায় সর্ব্বদা একসঙ্গে রাখিতে ভালবাসে। ভুবনকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা অতি সামান্য কার্য্যও সম্পাদন করে না।

আরও দুইটি স্ত্রীলোক সতীশের আশ্রিত হইয়াছে। এক বিরজা, অপরা—রোসেনারা।

পাঠক মহাশয় বোধ হয় ভুলেন নাই, অশ্বত্থ তরুতলে দুইটি স্ত্রীলোক ছিল, এক সরোজা অপরা এই রোসেনারা। রোসেনারা যখন শুনিল, যুদ্ধে হিন্দুরা জয়লাভ করিয়াছে, তখনই সে ভাবিল,

অবশ্য প্রথানুযায়ী বিপক্ষেরা বাড়ী লুট ও রমণীগণের উপর বল প্রকাশ করিবে। অতএব শত্রু প্রবেশের অগ্রে পলায়ন করাই উচিত। সে ইহা ভাবিয়া পলায়ন করিতেছিল, সরোজাও সেই সময় বনদেবীর জন্ত জল আনিতে গিয়াছিল। পথিমধ্যে উভয়ের দেখা হয়, উভয়ে উভয়কে চিনিত—সরোজা রোসেনারাকে আশ্বাস দিয়া সঙ্গে আনিয়াছিল।

আর একটা কথা। এ ভয়ানক যুদ্ধ-ব্যাপার সংবাদ, মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট প্রেরিত হইল। নবাব ও বিপক্ষদল-দলন জন্য সৈন্য পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু সে উদ্যোগ ব্যর্থ হইল। সেই সময় কর্ণেল ক্লাইবের পত্র সিরাজ-উদ্দৌলার হস্তগত হয়, সে পত্রের লিখনভঙ্গী দেখিয়া ইংরাজের সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য্য স্থির করিয়া অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুতরাং সাতুরে আর সৈন্য পাঠান হইল না। তাঁহার পর নবাব সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে পলাশির বাগানে ইংরেজ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলেন, কাজেই সাতুর সম্বন্ধে আর কোন কথাই হইল না।

(২)

সতীশচন্দ্র নিজবাটী হইতে একটু দূরে রোসেনারার একটা বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সেই বাড়ীর পূর্ব্বধারে, খুব বড় রকমের ফুলের বাগান। বাগানে মল্লিকা, গোলাপ, বেল,

যুঁই, যাথি প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের ফুলবৃক্ষ রোপিত। কোথাও প্রস্ফুটিত ফুল, কোথাও কলিকা বাতাসভরে দুলিতেছে, নিঃস্বার্থ প্রেমের পূর্ণতা দেখাইতে যেন বিধাতা তাহাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। তাহারা অকাতরে, অযাচিতে সৌরভ ঢালিতেছে।

সতীশচন্দ্র একা সেই পুষ্পোদ্যানে। যেন কোন গভীরভাব তাঁহার প্রাণের ভিতর লুকাইত রহিয়াছে। সতীশচন্দ্র পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় রোসেনারার কক্ষ হইতে সুন্দর গীতের স্বরলহরী বাতাসভরে দুলিতে-দুলিতে আর শ্রোতার কর্ণবিবরে মধু ঢালিতে ঢালিতে উত্থিত হইতে লাগিল। সতীশচন্দ্র স্থিরকর্ণে তাহা শুনিতে লাগিলেন। গীত হইতে লাগিল—

আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি তোমারে,
তথাপিও তুমি ফিরে চা'বে না বারেক ফিরে।
তুমি যদি চাহ কভু কটাক্ষ-নয়নে,
কত সুধা ক্ষরে যেন এ তাপিত পরাণে;
কথা ক'লে কি যে হয়, জানাব কি' করে?
কি কঠিন তব প্রাণ, প্রাণ তা'ত জানিনা,
আমি মরি তব লাগি, তুমি ফিরে চাহনা।
সুরেন্দ্র অশনি সদা হৃদি-মাঝে হান রে।

সতীশচন্দ্র গান শুনিতে শুনিতে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "উঃ, আমি কি কঠিন! আমি কি পাষণ্ড! একজন আমার জন্য পাগল, সে আমার নিকট কিছুই চাহে না, একবার দেখা। দিনান্তে একটিবার আমায় দেখা দিও, আমি তাহাতে বড় সুখ পাই, না দেখা দিলে প্রাণের ভিতর জ্বলিয়া যায়, এক-একবার আমায় দেখা দিও—এই অনুযোগ। যাই, আর অপেক্ষা করিব না, হইলই বা মুসলমান—তাহাতে কি?"

ক্ষণিক স্থিরভাবে থাকিলেন, শেষে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন; "উঃ, মুসলমান রোসেনারা! অত সৌন্দর্য্য অত গুণরাশি লইয়া কেন মুসলমানের ঘরে জন্মিয়াছিল রে!" আবার বলিলেন, "হউক মুসলমান, আর সহ্য হয় না। অত ভালবাসার প্রতিদান দিতে কেন কুণ্ঠিত হইব? আজই এই মুহূর্ত্তেই রোসেনারাকে বুকে করিয়া তাহার আশা-পূরণ ও আমার হৃদয়ের তৃপ্তিবিধান করিব।" এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ক্ষণিক কি ভাবিয়া রোসেনারার গৃহাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে দশবার থামিয়া পড়িলেন, কত কি ভাবিলেন, শেষে সেখানে উপস্থিত হইলেন। একটি কক্ষদ্বার ঠেসান ছিল—ঠেলিলেন, ঠেলিবামাত্র খুলিয়া গেল।

কক্ষটি সুন্দরভাবে সজ্জিত। বড় বড় ছবি, বড় বড় মুকুর গৃহ-ভিত্তির সাতিশয় শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। গৃহতল সুন্দর মখ্‌মলের কার্পেটে আচ্ছাদিত। পূর্ব্বধারে জানালার নিকট একখানি পিত্তলের পালঙ্কে সুন্দর শয্যা শোভা পাইতেছিল। তাহার উপর রোসেনারা একটা উপাধানে অর্দ্ধশয়নাবস্থায় বসিয়া গান গাহিতেছিল।

রোসেনারা যবনী হউক, কিন্তু তাহার রূপপ্রভা যেন উছলিয়া-উছলিয়া উঠিতেছিল। বর্ষার কূলপ্লাবিনী তরঙ্গিনীর ন্যায় তাহার হৃদয় যৌবনে পরিপূর্ণ। বর্ণ—মনমোহকর গোলাপী আভাযুক্ত, তাহাতে যেন আবার কিরূপ পদার্থ সংলগ্ন আছে, দেখিলে নয়ন মুগ্ধ হয়, মন প্রাণ উদাস হয়। নয়ন ছু'টি পটলচেরা, পাগল করা বিষে-ভরা। অধরোষ্ঠের সম্মিলন কি মনোহর, দেখিলেই প্রাণ যেন উধাও হইয়া কোন্ সুখরাজ্যে স্বপ্ন সুধানুসন্ধানে রত হয়—

তাহার অস্তিত্ব লোপ পায়। সেই মনুমোহন গঠন-পারিপাট্যের ও লালিত্যের ত' কথাই নাই, তাহাতে আবার মণিময় কারুকার্য্য-খচিত রত্নালঙ্কার শোভা পাইতেছিল। পরিহিত লাল রঙ্গের শাড়ী, বক্ষে মনোহর কাঁচলী, অঙ্গে কারুকার্য্য প্রভাবে অনন্ত নক্ষত্র-খচিতবৎ ওড়্না। পৃষ্ঠদেশে কাল-ভুজঙ্গিনী তুল্য লম্বমান বেণী।

সতীশচন্দ্র দ্বার খুলিয়া সেইস্থানেই দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে রোসেনারার সুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রোসেনারাও দ্বারোদ্ঘাটন শব্দে সেদিকে চাহিয়া আর নয়ন ফিরাইতে পারিল না। দুইজনই আত্মহারা—দুইজনই নির্ব্বাক—নিষ্পন্দ! শেষে রোসেনারা সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, "বিধাতা কি অভাগিনীর আশা-প্রসূন প্রস্ফুটিত করিলেন!"

সতীশচন্দ্র ঢোক গিলিয়া, থামিয়া, ললাটের স্বেদনীর মুছিয়া কহিলেন, "রোসেনারা! বিধাতা তোমার কি আশা পুরাইলেন?"

রোসেনারা মর্ম্মভেদী এক বিলোল-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সতীশের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া বলিল, "স্ত্রীজাতির আশা করিবার এ জগতে কিছুই নাই; আছে কেবল এক ভালবাসা—কিন্তু স্ত্রীজাতি ভালবাসিবার উপাদান পায় না, যদি কখনও পায়, তবে তাহাই তাহার আশা-ভরসা। সে আশার পাদমূলে তাহার জীবন যৌবন সকলি। আমি নিতান্ত অভাগিনী, তাই সে উপাদান পাইয়াও তাহার পদতলে যৌবন দিতে পারিলাম না—কিন্তু দিব। অনন্ত-স্রোতস্বিনীর অনন্তস্রোত প্রবাহিত হইলে সামান্য বাঁধে কি তাহা রাখিতে পারে সতীশবাবু?"

সতীশ সে কথায় একেবারে আত্মবিস্মৃত হইলেন। প্রাকৃতিক

মোহজালে আজ বীরপুরুষ বিজড়িত হইল। হায়! এ জগতে কত বীর, কত সাধু, কত যোগী, কত ধার্ম্মিক, কত বিদ্বান্ যে আপনার দায়িত্ব ভুলিয়া ঐ রমণীর জন্যই ঐ মোহজালে আপনি পড়িয়া জড়াইয়া জড়াইয়া মরিতেছে, কে তাহা বলিতে পারে? হায় বিধাতা, হরিণের জন্য বাঁশী, ভ্রমরের জন্য কেতকী, পতঙ্গের জন্য বহ্নি, আর পুরুষের জন্য রমণী কেন সৃজন করিয়াছিলেন?

সতীশ বলিলেন, "রোসেনারা, তুমি মরিবে কেন?"

রোসেনারা সে কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নিস্তব্ধে সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল, শেষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। শুইয়া গাহিতে লাগিল,—

আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি তোমারে,
তথাপিও তুমি ফিরে চাবে না বারেক ফিরে!

তখন সতীশচন্দ্র রোসেনারার পার্শ্বদেশে গিয়া বসিলেন। উভয়ের হৃদয় পুলকিত ও প্রেমোৎফুল্ল হইল। রোসেনারা গান বন্ধ করিয়া সতীশের গলা ধরিয়া বলিল, "তুমি কি আমার?"

"এ দেহে যত দিন প্রাণ থাকিবে, তত দিন আমি তোমারই।" এই বলিয়া সতীশচন্দ্র রোসেনারার সুন্দর গোলাপীগণ্ডে—লিখিতে লজ্জা করে—চুম্বন করিলেন।

---

(৬)

সরোজা ও বিরজা দুইজনে প্রাসাদোপরি বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল।

বিরজা বলিল, "তা, তুমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ব'লে যত ফল হবে, অন্যে ব'লে কি আর তত' হয় ?"

সরোজা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "সখি ! আর কি সে দিন আছে ? যাহার আজ্ঞায় সতীশচন্দ্র জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারিত, যাহার অনুমতি না পাইলে সতীশ আমার সহিত পর্য্যন্ত কথা কহিত না, সেই সতীশ আজ কিনা সেই পবিত্রচেতা, ধর্ম্মের আদর্শ, দরিদ্রের বন্ধু, পীড়িতের শান্তি ভুবনকে সংহার করিতে উদ্যত ! আমি ত কোন্ ছার সখি ?"

বিরজা। ঠিক্ ব'লেছ, ও ছুঁড়ি বোধ হয় সতীশকে কি করেছে।

সরোজা। সই, সকলই আমার অদৃষ্ট। যাহা হউক, সে যাহা কপালে ছিল তাহাই হইল, কিন্তু কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত ! রোসেনারা মন্ত্রণা দিয়া সাংসারিক সুখদুঃখ-বিবর্জ্জিত ভুবনকে সংহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। কি হবে ভাই ?

এই সময় অনেক দিনের পর সতীশচন্দ্র সরোজার গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিরজা সরোজাকে কহিল, "আমি তবে এখন আসি। সতীশ বলিলেন, "কেন যাবে ?"

বিরজা। স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলন স্থানে কি অন্যের থাকিতে আছে ?

সতীশ। সরোজা আমার স্ত্রী, আমি সরোজার স্বামী এ সম্বন্ধ এখন আর ভাবিও না। সরোজা দেবী, আমি পশু। যাহা করিতে লঘুচেতা মনুষ্যেও ঘৃণা করে—সরোজাকে আমি তাহাই করিতেছি।

বিরজা। তাহা করিতেছেন কেন? ইচ্ছা করিলে এখনও ত সে পাপময় পথ পরিত্যাগ করিতে পারেন। সতীশ বাবু, আমাদের অনুরোধ, প্রজাদিগের অনুরোধ, ভুবনের অনুরোধ, সখি সরোজার অনুরোধ, জাতির অনুরোধ, হিন্দুধর্ম্মের অনুরোধ, আপনি উহাকে পরিত্যাগ করুন। সতীশ বাবু, দেবী সরোজা হইতে—দ্বিচারিণী যবনী রোসেনারা কিসে ভাল হইল?

সতীশচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বিরজা, তোমরা আমাকে উপদেশ দিয়া কি করিবে? আমি সকলি বুঝি, উপদেশও অনেক দিতে পারি। কিন্তু রোসেনারাকে তিলার্দ্ধ না দেখিলে প্রাণের ভিতর কেমন যেন কি করে। তাহার কথা প্রতিপালন না করিলে যেন আমার জীবনের মহা হানি হইয়া যায়। প্রতিপদে ইচ্ছা করি, তাহার নিকট হইতে পিছাইয়া পড়ি, কিন্তু অগ্রসর হই, পিছাইতে পারি না।"

এই সময় সেই গৃহে ভুবনমোহন প্রবেশ করিলেন। সতীশচন্দ্রের কথা শুনিয়া বলিলেন,—

"সতীশ, তোমার ন্যায় বীর ও ধার্ম্মিক পুরুষের নিকট এরূপ শুনিবার আশা কখনও করি নাই। যে হৃদয় জাতীয় জীবন রক্ষার জন্য উন্মত্ত, শত শত আহতের আর্ত্তনাদ, হতব্যক্তির ছট্‌ফটানি ও রক্তের নদী দেখিয়াও টলে নাই; ধর্ম্মের জন্য যে হৃদয় লালায়িত—নীতির জন্য অনুপ্রাণিত ছিল, আজ কিনা সেই

হৃদয় সামান্ত পাপময় কার্য্যের জন্য এত গলিয়া গেল!—একেবারে স্বর্গ হইতে নরকে পতন!"

সতীশ। বুঝি সকলই, কিন্তু মনকে কিছুতেই সে পথ হইতে ফিরাইতে পারি না।

ভুবন। মনুষ্যদিগের প্রবৃত্তিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আর এক পাপপ্রবৃত্তি। মানুষের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কোনরূপে একটু নিস্তেজ হইয়া পড়িলেই পাপপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। প্রবল ও দুর্ব্বলের ঘাত-প্রতিঘাতে যাহা ঘটিয়া থাকে, এই উভয় প্রবৃত্তির বিবাদেও তাহাই ঘটে। প্রবল পাপপ্রবৃত্তির সহিত যুঝিতে-যুঝিতে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তখন পাপপ্রবৃত্তির জন্য ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আর কিছুতেই বর্দ্ধিত হইতে পারে না। কাজেই মানুষ জানিয়া শুনিয়া পাপপ্রবৃত্তির আয়ত্তে রহিয়া যায়। এইজন্য হিন্দু-মনীষিগণ সাধারণ উপকারার্থে নিত্য-সন্ধ্যা, পৌত্তলিক পূজা, ব্রতবিধান ও ক্রিয়াকাণ্ডের সৃজন করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ সকল ধর্ম্মমূলক ব্যাপারে পর্য্যলিপ্ত থাকিলে ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরই পরাক্রম বর্দ্ধিত হয় ও পাপ-প্রবৃত্তির ক্ষমতা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে থাকে, কিন্তু শক্তিসাধকের পক্ষে সে বিধান নহে, সেখানে প্রবৃত্তি-মার্গের সর্ব্বতোমুখী বিনাশ ও নিবৃত্তির আবাস। তোমার এখন পাপপ্রবৃত্তি প্রবল, পরিশ্রম করিয়া তাহাকে নিস্তেজ কর—ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল কর—আবার পুনরায় সুপথ পাইবে।

সতীশ। সে সকল উপদেশ বৃথা। এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, রোসেনারা তোমাকে যে অনুরোধ করিয়াছিল, তুমি তাহাতে স্বীকৃত আছ কি না?

ভুবন। কিরূপে স্বীকৃত হইব ?

সতীশ। কেন ? হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান ইহাদিগকে কি ঈশ্বর ভিন্ন-ভিন্নরূপে সৃজন করিয়াছেন ? সকলেই কি এক নহে ? তুমি যখন শক্তি-সাধক, তখন তোমার নিকট জাতিভেদ কি ভাই ! অতএব অনুমতি দাও, আগামী পরশ্বদিবসে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলনী ভোজন হইয়া যাউক।

ভুবন। সতীশ বাবু ! জ্ঞান, জ্যোতি, নৈতিকপ্রভা, ধর্ম্মের উষার আলো, সকলই এখন তোমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়াছে ; সুতরাং স্রোতের মুখে বালির বাঁধের ন্যায় যে কোন সার কথা তোমার নিকট উত্থাপিত হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ ভাসিয়া যাইবে। তুমি বলিলে, শক্তি সাধকের নিকট জাতিভেদ নাই, সেটা প্রামাণিক কথা বটে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—মুচি, মুসলমানের হাতের দুইটা ভাত খাইয়া বেড়াইলেই জাতিভেদ কি উঠাইয়া দেওয়া হইল ? জাতিগত যে পার্থক্য, হৃদয় হইতে তাহা উৎপাটন করার নামই জাতিভেদের উচ্ছেদ। একজন ধনবান ব্রাহ্মণকে দান করিতে আমার যে আগ্রহ আছে; একজন দীন-হীন মুসল মানের উপরও তাহা হওয়া চাই। একটি সুন্দরী হিন্দু যুবতী ব্যাধিক্লিষ্ট হইলে, তাহার শুশ্রূষার জন্য আমার যে ইচ্ছাশক্তি ব্যয়িত হইবে, একটি বৃদ্ধা মুচিনীর জন্যও তাহাই হওয়া চাই। সাধু ব্রাহ্মণ ও মুসলমান একইরূপ সম্মানিত এবং দুষ্ট হইলে সমভাবে দণ্ডিত হইবে। এ মুচি, ইহার দারুণ ক্ষুধায়ও একমুষ্টি অন্ন দেওয়া হইবে না, উনি ব্রাহ্মণ, উহাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সরপুরিয়ার ছাউনি বাড়াইয়া খাওয়াইয়া তৈলাক্তশিরে তৈল প্রদান করা হইবে—ইহা না হইয়া সর্ব্বজীবে সমভাবে

দেখার নামই জাতিগত পার্থক্যহীনতা এবং ইহারই অপর নাম জাতি ভেদের উচ্ছেদ। নতুবা বার-জাতির বাড়ী খাইয়া বেড়ানকেই পণ্ডিতগণ জাতিভেদ উঠানো কহেন না।

সতীশ। তোমাকে রোসেনারার হাতের দু'টা ভাত খাওয়ালেই এমন কি দোষ হইবে?

ভুবন। দোষ অনেক হইবে। আমি তাহা হইলে সমাজ শঙ্করের কারণ হইব। আমাকে যদি কেহ বিশ্বাস করে—এমন যদি কেহ থাকে—তবে সেও ঐরূপ হইবে সন্দেহ নাই।

সতীশ। সমাজ ত কাহারও সঙ্গে যাইবে না! উহাতে ত' আধ্যাত্মিক কোন দোষ নাই!

ভুবন। আছে বৈকি, যাহা সমাজের অকল্যাণকর, তাহা সর্ব্বদোষের কারণ।

সতীশ। দেশস্থ সমস্ত লোক বলিতেছে, ভুবন যদি বলেন, আমি মুসলমানের ভাত খাই, তোমরা খাও; তবে আমরা পারি। তুমি না খাও,—মুখেই কেন বল না?

ভুবন। প্রবঞ্চনা করিয়া অন্যকে বিপথে লওয়া, ইহা হইতে পাপকার্য্য আর কি আছে সতীশ বাবু? তোমার পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করিতেছি—তুমি উহাকে বিস্মৃত হও। দেখ, তুমি যাহার জন্য এত উন্মত্ত হইয়াছ, যাহার জন্য ধর্ম্মকে পদদলিত করিতেছ, তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ কি? তুমি কি সেদিনের কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিতেছ না? যেদিন তুমি, আমি, রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান্, মূর্খ, সুশ্রী, কুশ্রী, শ্মশানের চিতাভস্মে মিশিয়া রহিব, যেদিন ভালবাসার পরিণাম, জীবনের পুরস্কার, অত্যাচারের কালিমা-চিহ্ন, অবিচারের ভীমদণ্ড, দরিদ্র

পীড়নের অনন্ত অভিশাপ মাথায় করিয়া আতপ-তাপ-দগ্ধ শুষ্ক-পত্রের মত, ঐ সুপক্ক বৃন্তচ্যুত ফলের মত তুমি আমি ঝরিয়া পড়িয়া পচিয়া যাইব—সেদিনের কথা কি দিনান্তে একটিবারও চিন্তা কর না? ভাই! আজ হউক, কাল হউক, আর দশদিন পরেই হউক, এ পথিকের পান্থশালা অপেক্ষাও ক্ষণবিশ্রামস্থল পৃথিবীর ধূলাখেলার বসতবাটী ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। তবে তুমি কেন, অত অনিমেষ স্নেহনয়নে ঐ একখানি মুখের প্রতি চাহিয়া ধর্ম্মধনে বঞ্চিত হইতেছ? কাহার জন্য চিন্তা করিয়া তনু অস্থিসার করিতেছ? যাহাকে তুমি কল্পনার প্রেমময় সুখ-সিংহা-সনে বসাইয়া আপনার হৃদয়-কুসুম দিয়া দিবানিশি পূজা করিতেছ, সে তোমার কি, তাহা আজ পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পার নাই। হায়, সে আদরের আদর ত তোমার চিরসহচরী হইয়া তোমার অনন্ত অন্ধকারময় ভবিষ্য জীবন-পথে আলো ধরিয়া যাইবে না! সব একা—একা। কেহ কাহারো নহে। "তোমার" "আমার" কেবল কথা মাত্র। "ওগুলা "জীবনের সীমা—দুদিনের ব্যক্তিগত প্রেম, আত্ম-বিড়ম্বনা। সতীশবাবু, একবার আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আপনাকে অধ্যয়ন কর। তুমি যে মোহে আবদ্ধ, তাই ত' তোমার এত গোলমাল। তাই ত' তুমি পথ চিনিতে পারিতেছ না। এখানে পথ দেখাইবার কেহ নাই। আপনার পথ আপনি চিনিয়া লও—মার মোহে আবদ্ধ হইয়া পাপে পূর্ণিত হইও না।

সতীশ অনেকক্ষণ স্থিরভাবে কি চিন্তা করিলেন, শেষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সময় কত?"

বিরজা বলিল, "প্রায় রাত্রি ছয় দণ্ড।"

সতীশ। আমি তবে চলিলাম।

বিরজা। আজ সরোজার গৃহে থাকিবেন না?

সতীশ। থাকিতে পারি কই? রোসেনারা ভিন্ন কাহারও নিকট বসিতেও যেন কষ্ট হয়, আমি চলিলাম।

সরোজা ছুটিয়া গিয়া সতীশের পদপ্রান্তে লুটিয়া পড়িল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো, আমায় ফেলে কোথা যাবে? আমি যে তোমার দাসী। আমি যে তোমা বই আর জানি না। প্রাণেশ্বর! আর যাতনা দিও না, যদি হৃদয় চিরিয়া দেখাইবার হইত, তবে দেখাইতাম তোমা-বিহনে এ হৃদয় কিরূপ শ্মশান হইয়াছে। তোমা-বিহনে আমার আর কে আছে? আমায় ফেলে যেও না।"

"সরিয়া যাও!" বলিয়া সরোজাকে পদদ্বারা ঠেলিয়া ফেলিয়া সতীশচন্দ্র বাহির হইয়া গেলেন। ভুবন ও বিরজা সেই সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। সরোজা সেই স্থানে পড়িয়া লুটিয়া-লুটিয়া কাঁদিতে লাগিল।

(৪)

সতীশচন্দ্র সে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া একেবারে রোসেনারার গৃহে গমন করিলেন।

রোসেনারা বলিল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

সতীশ থতমত খাইয়া বলিল, "সেই বিষয়ে ভুবনকে অনুরোধ করিতেছিলাম।"

রোসেনারা চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "সেটা মিছে কথা, আসল কথা কি বল দেখি ?"

"সতীশ। আসল কথা আবার কি ?"

রোসেনারা। গোপন-বিহার হইতেছিল—সরোজার গৃহে ছিলে। তা থাকিলেই বা আমি কি করিব। ঘ'সে-মেজে রূপ, আর ধ'রে-বেঁধে পীরিত—আমার ঠিক তাই।

সতীশ। না রোসেনারা, আমি তোমারই। তবে সরোজার ঘরে একবার গিয়েছিলেম বটে।

"আমি তা' জানি গো জানি" বলিয়া রোসেনারা কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সতীশের প্রাণে তাহা সহ্য হইল না, সে অশ্রু-জল—দারুণ কণ্টকরূপে সতীশের প্রাণ বিদ্ধ করিতে লাগিল। সতীশ রোসেনারার অশ্রুপ্লাবিত সুন্দর মুখখানি ধরিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল, "প্রিয়তমে! সতীশ তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানে না। তোমার নিকট সতীশ প্রাণেরও মমতা রাখে না। রোসেনারা! তোমার মুখ বিরস দেখিলে আমি জগৎ অন্ধকার দেখি। আমায় ক্ষমা কর, আমি আর কখনও সরোজার গৃহে যাইব না।"

রোসেনারা চারু-অঞ্চলে চক্ষুর জল মুছিতে-মুছিতে বলিল, "তোমার মুখে মধু—গরল প্রাণে, চাঁদখানি দাও হাতে এনে।" আমি একটা সামান্য অনুরোধ করিলাম, তা সম্পন্ন ক'রেন না— আর কথায় কথায় বলেন, "রোসেনারা, তোমার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি।"

সতীশ। সেই জন্যে ত' এত বিলম্ব।

রোসে। তার জন্য প্রিয়তমা মহিষী সরোজার গৃহে কেন ?

সতীশ। সরোজা অনুরোধ করিলে, ভুবন সহজে স্বীকৃত হইবে ভাবিয়া।

রোসে। সরোজা ও ভুবনে বড় পীরিত—না?

সতীশ। ঠোঁট মুখ চাটিয়া বলিলেন, "হাঁ, উভয়ে উভয়কে ভালবাসে বটে।"

রোসে। আমি তোমার বাড়ীর একটি দাসীর মুখে শুনিয়াছি, উহাদের মধ্যে গুপ্ত প্রণয়েরও বড় বাড়াবাড়ি।

সতীশ। দূর, তা কেন? ভুবন জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক।

রোসে। ওটা মুখের কথা। গুপ্তপ্রেমের গুপ্তভাবই ঐরূপ। ভাল, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি যখন সরোজার গৃহে গিয়েছিলে, ভুবন তখন কোথায় ছিল?

সতীশ। তা জানিন', আমি গেলে, একটু পরেই এল।

রোসে। তুমি ডাকিয়াছিলে?

সতীশ। না।

রোসে। তবে সে জান্‌লে কেমন ক'রে যে, তুমি সেথায় আছ? এখন বোধ হয় আসল কথা বুঝিতে পারিয়াছ যে, তোমার স্ত্রীর হৃদয়-মধু পান করিতে ভুবন-মধুকরের শুভাগমন? তুমি বল, ভুবন তোমার পরম বন্ধু, প্রকৃত প্রস্তাবে সে তোমার পরম শত্রু।

রোসেনারার মুখে এই কথা শুনিয়া সতীশ একেবারে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার বুকের ভিতর কি যেন কি হইতে লাগিল। মনে ভাবিলেন, "ঠিক কথা। সরোজার সহিত যদি ভুবনের গুপ্তপ্রণয় না থাকিবে, তবে আর ভুবন সেখানে কি করিতে আসিবে? দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,

"উঃ, কি বিশ্বাসঘাতী—আর কাহারও অনুরোধ শুনিব না, কাহারও কথায় দৃক্‌পাতও করিব না। রোসেনারা! তুমি আমার চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া কতদিন—কতদিন উহা দেখাইয়াছ, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নাই। আজ আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে। আমি ভুবনকে নিশ্চয় বিনাশ করিব—দেখি কাহার সাধ্য তাহাকে রক্ষা করে।"

কুটিল-কৌশলা চতুরা রোসেনারা মনে মনে হাসিল এবং বলিল, 'সতীশ, তুমি বা কত চতুর, পুরুষগণকে চতুর করিতেই তো বিধাতা আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। ভুবনের জন্য আমার আশা মিটাইতে পারিতেছি না, তাহাকে ধ্বংস করিতে না পারিলে হিন্দুর গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার সুবিধা পাইতেছি না। এ জন্য কত কৌশল, কত চাতুর্য্যজাল বিস্তার করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইতে পারি নাই, আজ বোধ হয় আমার আশালতা মুকুলিতা হইল!' প্রকাশ্যে বলিল, "যা হউক সতীশ বাবু, দেখ, আমার এই একটী কার্য্যে ভুবন সম্পূর্ণ বাধা দিতেছে। তোমার স্ত্রীকে লইয়া যাহা করিতে নাই—তাহা করিতেছে। তুমি যদি মানুষ হও, মনুষ্যশোণিতে যদি তোমার দেহ গঠিত হয়, তবে বোধ হয় আর উপেক্ষা করিবে না। অদ্যই তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেল। আর যদি তাহা না করিতে পার, তবে জানিলাম তুমি নিতান্ত কাপুরুষ।"

সতীশচন্দ্র রোষকষায়িত লোচনে রোসেনারার বদন প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "রোসেনারা, আর আমাকে বাক্যবাণে দগ্ধ করিও না। আমি এখনই ভুবনকে ধ্বংস করিব।

তৎক্ষণাৎ একজন দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "শীঘ্র কালেখাঁকে

ডাকিয়া আন্।” দাসী দ্রুতপদে কালেখাঁকে ডাকিতে গেল। কালেখাঁ সতীশের একজন অনুগ্রহপ্রার্থী সৈনিক।

রোসেনারা মনে মনে বুঝিল, এতদিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হইল। এতদিনে আমার পরম শত্রুর বিনাশবিধান হইল। রোসেনারা ভুবনকে পরম শত্রু জ্ঞান করিত। ভুবন ধার্ম্মিক—রোসেনারা পাপের পূর্ণমূর্ত্তি—দ্বিচারিণী। যাহারা পাপে প্রমত্ত, পাপ-সাগরে একেবারে ডুবিয়াছে, কে জানে কোন্ দৈবশক্তির প্রভাবে তাহারাও মৌখিক না হউক, আন্তরিক ধার্ম্মিকগণকে ভক্তি না করিলেও একটু ভয় করে। এই স্বতঃসিদ্ধ বিধানানুসারে রোসেনারা ভুবনকে ভয় করিত। আরও বিশেষতঃ ভুবন সর্ব্বদাই সতীশকে রোসেনারার নিকট গমন করিতে নিষেধ করিত, কত ধর্ম্মভয় দেখাইত, এবম্বিধ বহুকারণে রোসেনারার চিত্তে ভুবনের মূর্ত্তি শত্রুরূপে প্রতিফলিত হইত। তাহার পর আজ মাসাবধি হইল, রোসেনারা সতীশের নিকট অনুরোধ করিয়াছে—“সকলেই আমাকে মুসলমান বলিয়া বড় ঘৃণা করিয়া থাকে, এ অপমান আর আমার প্রাণে সহ্য হয় না। তুমি এদেশের জমিদার, তুমি না করিতে পার এমন কাজই নাই। আমার এ দুঃখ ঘুচাইয়া দাও—হিন্দু মুসলমানে একত্রে আমার বাড়ীতে ভোজন করুক।” ইহার জন্য রোসেনারা বড় পীড়াপীড়ি করিতেছে। সতীশও সে জন্য বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। দেশশুদ্ধ লোক ইহার বিরোধী। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের সহিত বিরোধ করিয়া তাহারা কিছুই করিতে পারিবে না। তবু তাহাদের সহায় ভুবনমোহন। সুতরাং এ সাধের কার্য্যে যখন ভুবন বিরোধী, তখন রোসেনারা ও সতীশের সে পরম শত্রু। সতীশ রোসেনারার

পরামর্শে ভুবনকে কতদিন সংহার করিতে গিয়াছেন, কিন্তু কে জানে কেন তিনি তাহাতে পিছাইয়া পড়িয়াছেন। শেষে রোসেনারা দেখিল, ভুবনের পক্ষে গুরুতর দোষ সাব্যস্ত করিতে না পারিলে সফলকাম হওয়া যাইবে না। তাই আজ সে কয়দিন ধরিয়া ভুবন ও সরোজার প্রণয়ঘটিত মিথ্যা কথা বলিতেছে; আজ সতীশ তাহা বিশ্বাস করিলেন।

কালেখাঁকে ডাকিতে পাঠাইয়া সতীশচন্দ্র রোসেনারাকে বলিলেন, "রোসেনারা, আমি বোধ হয় আর অধিকদিন বাঁচিব না। সর্ব্বদাই যেন আমার প্রাণ পালাই-পালাই করিতেছে।"

রোসেনারা সতীশের মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "বালাই, অমন কথা কি বল্‌তে আছে—তুমি মদ খাবে?"

সতীশ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "খাব।" রোসেনারা মদ আনিল—দুইজনে খাইতে বসিল। মদ খাইতে খাইতে রোসেনারা গান গাহিতে লাগিল। এই সময়ে কালেখাঁ আসিয়া সেলাম জানাইল। সতীশ তাঁহাকে বলিলেন, "কালেখাঁ! এতদিন তোমাকে বেতন দিয়া রাখিয়াছি, প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছি, আজ তাহার প্রতিদানে ভুবনের মস্তক আনিয়া রোসেনারার পাদপদ্মে উপহার দাও।"

কালেখাঁর উপর এরূপ হুকুম,—অবশ্য এত কড়া নহে, আরও দুই একদিন হইয়াছিল। সে বলিল, "হুজুর, ভুবনকে আমি হত্যা করিতে পারিব না, আপনার নিকট ধরিয়া আনিয়া দিতেছি।"

"শীঘ্র আন্।" বলিয়া সতীশচন্দ্র আবার মদ্যপান করিতে লাগিলেন।

(৫)

কালেখাঁ ভুবনকে আনিতে গেল, রোসেনারা যে তাহাতে কত আনন্দানুভব করিতে লাগিল, তাহা সামান্য লেখনীর বর্ণনীয় নহে। তখন সে মনে মনে আর একটা পরামর্শ আঁটিয়া লইল। সতীশের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "সতীশ, প্রাণেশ্বর, আমি যে পূর্ব্বজন্মে কত পুণ্য করিয়াছিলাম, তাহা বলিবার নহে। তোমার মত প্রণয়ীশ্বার, এজগতে নেই সুখা।"

সতীশ প্রেম-রসে গলিয়া গেলেন। বলিলেন, "আমি বহু পুণ্যফলে তোমায় পেয়েছি।"

রোসেনারা মায়ের নাকের নোলক দুলাইয়া বলিল, "আমার আর একটি কথা শুনিবে?"

সতীশ। রোসেনারা! তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি, কথা শুনিব না?—কি বল।

রোসে। সরোজা ও বিরজা এক ভুবনের সহায়তায় তোমাকে ও আমাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছে, অতএব তাহাদিগকে এখানে আনাইয়া তাহাদের সম্মুখে যেন ভুবনকে হত্যা করা হয়।

সতীশ একথা শুনিয়া যেন কেমন একরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, বলিলেন, "তা' না করিলে কি হয় না?"

রোসে। এই যে বলিলে, আমি যা বলিব, তাই করিবে? যা হউক, একথাটা বলাও আমার অন্যায় হইয়াছে। হাজার হ'ক, সরোজা হ'ল—

সতীশ। না—সেজন্য নহে।

রোসে। তবে কি জন্য?

সতীশ। অত গোলযোগে কাজ কি?

রোসে। কাজ নাই সত্য, কিন্তু যদি একটু ভাবিয়া দেখ, তবে অনেক আছে। সরোজার সংস্কাতে ভুবনকে হত্যা করিলে সরোজা বুঝিবে যে, সতীশ আমাদের গুপ্ত প্রণয়ের কথা বোধ হয় জান্‌তে পেরেছিল, তাই ভুবনকে হত্যা করিল। আরও জানিবে, ভুবন হ'তে সতীশের ক্ষমতা অধিক। ভবিষ্যতে সাবধান হইবে।

সতীশচন্দ্র মুদিতনেত্রে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন, "তাহাই হইবে। কিন্তু বিরজাকে আনিবার আবশ্যক কি?"

রোসে। আছে, তুমি তা করিবে?"

সতীশ। কি, বল?

রোসে। বিরজা আমাকে মুসলমান ও ব্যভিচারিণী বলিয়া অতিশয় ঘৃণা করে। তোমার প্রেয়সী হইয়া আমার তাহা সহ্য হয় না। এইস্থলে কালেখাঁকে দিয়া বিরজার সতীত্ব হরণ করাইতে হইবে। তাহা হইলে উঁহার জাতি ও সতীত্ব-গৌরব ধ্বংস হইবে।

সতীশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "না, তা কখনই হবে না।"

রোসেনারা অঞ্চলাগ্রে চোক ঢাকিয়া নাকিস্বরে বলিল, "তবে আমাকে বিদায় দাও, আমি মরিব।"

অবশ্য সতীশের তাহা সহ্য হইল না। তিনি তখন দীর্ঘনিশ্বাস

পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "যাহা কপালে আছে তাহাই ঘটিবে; —তোমার কথা আমি অবশ্য প্রতিপালন করিব।" দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুই শীঘ্র আমাদের বাড়ীর মধ্যে গিয়ে আমার স্ত্রীকে বল্‌, বাবু রোসেনারার ঘরে আছেন, তাঁহার হঠাৎ কি ব্যায়রাম হইয়াছে, যাতনায় অস্থির হইয়াছেন, আমার সঙ্গে তুমি ও বিরজা সত্বর এস।" দাসী চলিয়া গেল।

কালেখাঁ ও আর দুইজন বলিষ্ঠ লোক ভুবনকে হাতাহাতি করিয়া ধরিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সতীশ হুকুম দিলেন, "উহাকে বাঁধিয়া রাখ।" তাহারা ভুবনের হস্তপদাদি দৃঢ়রূপে কসিয়া গৃহমধ্যেই বাঁধিয়া রাখিল। রোসেনারা কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য হার উন্মোচন করিয়া তাহাদিগকে দিল। তাহারা তাহা লইয়া চলিয়া যাইলে রোসেনারা বলিল, "তোমাদের একজনকে ভুবনের মস্তকচ্ছেদন করিবার জন্য থাকিতে হইতেছে। যে থাকিবে, তাহাকে আমি দুইশত টাকা পারিতোষিক দিব। একজন নিতান্ত নিষ্ঠুর ছিল, সে টাকার লোভে থাকিয়া গেল। রোসেনারা তাহার নিকট একখানি শাণিত কৃপাণ দিয়া কহিল, "হুকুম পেলেই ওকে কেটে ফেলো।"

এই সময়ে সরোজা ও বিরজা সেই গৃহে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া তাহারা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদিগের প্রাণ যেন অবসন্ন ও কম্পিত হইল। সতীশের অসুখের কথা শুনিয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতে আসিল, কিন্তু আসিয়া দেখে, তিনি সুরাপানে প্রমত্ত। ভুবন বন্ধনাবস্থায়। তাহাদিগের আর আসল ব্যাপার বুঝিতে বাকি রহিল না। সরোজা স্বামীর নিকট বসিয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "প্রভু!

প্রাণেশ্বর! একি ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছ নাথ! সত্যসত্যই কি অভাগিনীকে অকূলে ভাসাইলে? ভুবন ধার্ম্মিক, শুনিয়াছি ধার্ম্মিককে ধর্ম্মই রক্ষা করিয়া থাকেন। উঁহার কিছুই হইবে না, তুমি আমায় ফাঁকি দিবে। অন্ধের যষ্টি, দরিদ্রের নিধি, হত-ভাগিনীর কেবল তুমি একমাত্র সম্বল, তুমি আমায় ছাড়িয়া যাইবে?"

কালভুজঙ্গিনী তুল্য গর্জ্জন করিয়া রোসেনারা বলিল, "সতীশ বাবু, তোমার মহিষীর কথাগুলার ভাব শুন্‌লে? ছলে কৌশলে বলা হইতেছে, তুমি মর, আর ওঁর উপপতি ভুবন জীবিত থাক্, কি পোড়া কপালের কথা রে?"

মোহ ও মদিরামত্ত সতীশ রোসেনারার কথায় বিশ্বাস করিয়া উঠিলেন এবং ছুটিয়া গিয়া সরোজার বক্ষে এক ভীম পদাঘাত করিলেন। সরোজা কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আজ কতদিন পরে পদস্পর্শে পবিত্র হ'লুম। আজ আমার বুক শীতল হ'ল।" নিষ্ঠুর সতীশ পুনরায় পদাঘাত করিল। সরোজা এবার বড়ই ব্যথিতা হইল, বলিল, "আর মেরনা গো! আর সহ্য হয় না। আমায় কেন মারিতেছ বল নাথ, দোষ করিয়া থাকি, খড়্গাঘাতে কাটিয়া ফেল।"

সুদারুণ বন্ধন-ক্লিষ্ট ভুবন নিজ ব্যথা বিস্মৃত হইয়া সরোজার ব্যথায় ব্যথিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। বলিলেন, "সতীশ বাবু, এ কি নারকীয় পাশব অত্যাচার আরম্ভ করিলে? ধর্ম্ম কি নাই? হায় রোসেনারা! এমনি করিয়া কি দেশ উৎসন্ন দিতে হয়?" রোসেনারার তাহা সহ্য হইল না, দৌড়িয়া আসিয়া—ভুবন বসিয়াছিলেন—ভুবনের মাথায় এক লাথি

মারিল। ভুবন তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। বিরজা কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "কি হ'ল গো! পরম যোগী, পরম দয়াল, পরম দেবতা ভুবনের মস্তকে যবনীর, ব্যভিচারিণীর পদাঘাত! হা জগৎ, হা ধর্ম্ম, ইহা তোমরা এখনও সহ্য করিতেছ?"

সতীশচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই পালঙ্কে গিয়া বসিয়াছিলেন, রোসেনারা সেখানে গিয়া বসিল। রাগে ফুঁপাইতে-ফুঁপাইতে বলিল, "তবে রে পোড়ারমুখী বিরজা, দেখি তোকে কে রক্ষা করে। এখনি একজন মুসলমান পদাতিক দ্বারা তোর সতীত্ব নষ্ট করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সে একজন পদাতিককে ডাকিল। পদাতিক আসিয়া উপস্থিত হইলে, রোসেনারা বলিল, ঐ বিরজার উপর বলপ্রকাশে উহার সতীত্ব নষ্ট করিয়া দাও, আমি তোমাকে শতমুদ্রা পারিতোষিক দিতেছি।" সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

বিরজা আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুন্দর-ডাগর নয়ন যুগল হইতে প্রতপ্ত-অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে ভুবনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "গুরো, কি হবে গো! আমার স্বর্গের সম্বল সতীত্ব-রত্ন যে দস্যু কর্তৃক অপহৃত হইতে বসিল, আমায় কে রক্ষা করিবে গো?"

ভুবনের রুদ্ধপ্রবাহ যেন ভাঙ্গিয়া গেল, বলিলেন, "সতীশ! সতীশ! তুমি কি একেবারে অধঃপাতে গিয়াছ? একটা ঘৃণিত বেশ্যার কুহকজালে পড়িয়া এ কি কুকার্য্যে ব্রতী হইয়াছ, ভাবিয়া দেখ দেখি? এখনও সময় আছে, এখনও পথ চিনিয়া লও।"

সতীশচন্দ্র রোষকষায়িত লোচনে কহিলেন, "নরাধম, আর তোকে ধার্ম্মিকতা জানাইতে হইবে না। এখনি তোর সকল বুজরুকি ঘুচাইতেছি।"

রোসেনারা বলিল, "কেমন ভুবন, মুসলমানের সহিত খাইতে এখনও স্বীকৃত আছ কি না? যদি স্বীকৃত হও, তবে জীবন পাও, নচেৎ ঐ দেখ ঘাতক সশস্ত্রে বিরাজ করিতেছে; এখনি তোমার বক্ষঃস্থলের রক্তদ্বারা এ যবনীর পদরঞ্জিত হইবে।"

ভুবন শান্তভাবে, সহাস্যমুখে বলিলেন, "রোসেনারা, ধর্ম্ম বা নীতির বিরুদ্ধে ভুবনের জীবনে কোন কার্য্য হইবে না। তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার।"

রোসেনারা সতীশের মুখের দিকে চাহিল। সতীশ সে চাহনির অর্থ বুঝিলেন। বলিলেন, "ঘাতক, আর কেন?—ভুবনকে কাটিয়া ফেল।"

সে কথা শুনিয়া সরোজা ও বিরজা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঘাতক ভুবনকে কাটিতে খড়্গসহ হস্তোত্তলন করিল, অমনি গুড়ুম্ —— বন্দুকের শব্দ হইল।

সচকিতে সভয়ে সকলে চাহিয়া দেখিল, একটা গুলি আসিয়া ঘাতকের সশস্ত্র দক্ষিণ হস্তখানি স্কন্ধচ্যুত করিয়া দিয়াছে। সে মাটীতে পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলে আবার শুনিল, আবার বন্দুকের উপর বন্দুকের শব্দ হইল, গুম্—গুম্—গুড়ুম্! সে গুলি আসিয়া সতীশের ললাটদেশ ভেদ করিল, আর একটা গুলি তাঁহার দক্ষিণপদ ভগ্ন করিল। সতীশ তখন বৃন্তচ্যুত পক্কফলের ন্যায় পালঙ্ক হইতে ভূপতিত হইলেন। তাঁহার মুখ দিয়া ফেনরাশি নির্গত হইতে লাগিল। চক্ষুযুগল মুদিত হইল,—সতীশচন্দ্র চিরদিনের মত মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

কাহারা তাঁহাকে গুলি করিল, তাহা দেখিতে সকলে ব্যস্ত হইল, চাহিয়া দেখিল, বাহিরে প্রায় পঞ্চাশজন মাতব্বর প্রজা।

রোসেনারা এই ব্যাপারে একবারে মর্ম্মাহত হইল। সরোজা মাটীতে পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রজাদিগের মধ্য হইতে জনকয়েক গৃহমধ্যে আগমন করতঃ ভুবনের বন্ধন-মোচন করিয়া দিল।

তখন ভুবন সরোজার হস্ত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "সরোজা! ভগ্নি! আর কাঁদিয়া কি করিবে? এ জগতে যে ধর্ম্মহীন, তাহার শেষ দশাই ঐরূপ। অতএব শোক পরিহার করিয়া ধর্ম্মাচরণে জীবন সমর্পণ কর। এজগতে কেহ কাহারও নহে। ওটা কেবল বালক ভুলান কথা, এক্ষণে সতীশের আত্মা যাহাতে পুত-লোক প্রাপ্ত হয়, এরূপ শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য কর।

সরোজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দেব! স্ত্রীগণের স্বামীই দেবতা, স্বামীসেবাই পরম ধর্ম্ম। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার স্বর্গের সম্বল স্বর্গে গমন করিলেন। আমি আর কার মুখ চাহিয়া জীবিত থাকিব? আমি তাঁহার সহমৃতা হইব। তুমি আমার বন্ধুর কার্য্য কর, আমাকে স্বামীর সহমরণোপযুক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দাও।"

বিরজা কাঁদিতে-কাঁদিতে সরোজাকে সহমরণে যাইতে নিষেধ করিয়া কতমত বুঝাইল—সে তাহাতে বুঝিল না। বলিল, "সখি বিরজা! আমি আর এ জগতে কোন্ সুখে কাহার নিকট থাকিব? আমার সতীশ যেখানে গিয়াছেন, আমিও সেখানে যাইব।" ভুবনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ভুবন, সমস্ত বাড়ী, ঘর, দুয়ার সম্পত্তি থাকিল, এ সকল এখন তোমারই। তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না—তবে আমার একটী মাত্র প্রার্থনা, সতীশ যাহাকে ভালবাসিত, যদি এখনও সে বুঝিয়া-

বুঝিয়া চলে, তবে ঐ হতভাগিনী রোসেনারার পূর্ব্বাপরাধ বিস্মৃত হইয়া উহাকে যত্নে পালন করিবে।" ভুবন তাহাকে সহমৃতা হইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু সরোজা কাহারও কথা শুনিল না। সে সহমৃতা হইবে, ইহা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল।

বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় নদী-সৈকতে উচ্চশব্দে ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল, কাঁশর ঘণ্টা ও বিবিধ বাজনা বাজিয়া উঠিল। চতুঃপার্শ্বে অসংখ্য স্ত্রী পুরুষ দণ্ডায়মান। তাঁহার মধ্যে সতী সরোজা উপবিষ্টা। এক নাপিতানী আসিয়া তাঁহার হস্ত ও পদদ্বয়ের নখ কর্ত্তন করিয়া দিল এবং পবিত্র শীতল সলিলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া চরণযুগল অলক্তক রাগে রঞ্জিত করিয়া দিল। সরোজা স্নাত হইয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন, কপালদেশে ভাল করিয়া সিন্দূরের ফোঁটা দিলেন, গলদেশে প্রসূনমালা পরিলেন, সর্ব্বাঙ্গে বহুমূল্যের অলঙ্কার সন্নিবেশিত করিলেন, এবং খদির ও চূর্ণের পরিমাণ অধিক করিয়া দিয়া দুই একটি তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে বসিলেন। নিকটে যে সকল ভদ্রমহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন, তৎকালে সরোজার আঁখিতে অশ্রুবিন্দু নাই, বদনে মলিনতার চিহ্ন নাই, বরং মধ্যে মধ্যে হাস্য করিয়া তিনি আপনার স্বামী সংযোগের কথা বলিতেছিলেন। যেন বিবাহের জন্য পাত্রী নিজের বেশভূষা করিতেছে। কিয়ৎকাল পরে উলুধ্বনিতে গগনমার্গ বিদীর্ণ হইতে লাগিল এবং সেই রবের সহিত "হরিবোল" 'হরিবোল'' ও "মাতর্গঙ্গে" "মাতর্গঙ্গে"র ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

এদিকে বাদ্যযন্ত্রের উচ্চরব, বালিকাদিগের করতালি, স্ত্রীলোকের উলুধ্বনি এবং কুমারীদিগের সাবিত্রী উপাখ্যান হইতে—হইতে

চিতা প্রস্তুত হইল। ঘৃত, কুন্ড, শুষ্ক শন, চন্দনকাষ্ঠ এবং আতপ-তণ্ডুল ভারে ভারে সে স্থানকে অধিকার করিয়া বসিল। সরোজা এক হস্তে খৈ ও কড়ি এবং অপরহস্তে নবীন সহস্রার শাঁখা ধারণ করিয়া চিতাস্থানে পদার্পণ করিলেন। তখন চারিদিকে আনন্দ পূর্ণ "জয় মা সাবিত্রী" রবে কর্ণ বধির করিয়া তুলিল। খই এবং কড়ি ছড়াইতে ছড়াইতে চিতাকুণ্ডকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া সতী সরোজা জলন্ত চিতাগ্নিমধ্যে আপন পতিপার্শ্বে শয়ন করিলেন। অমনি যমদূতের ন্যায় দুইজন স্থূলকায় ব্রাহ্মণ-যুবা দুইটি বাঁশ দিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল। জলন্ত অগ্নিমধ্যে পুরোহিতেরা ভারে-ভারে ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ ও শন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দর্শকবৃন্দেরা উলু-উলু ও হরিধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ করিল। এদিকে বাদ্যকরগণ মহা আড়ম্বরে বাদ্যযন্ত্রে ঘা দিয়া তালে তালে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং রমণীকুল খই ও কড়ি কুড়াইবার জন্য ব্যস্ত হইল। বায়ু সহায়তায় চিতাগ্নি ধূ—ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শেষে যখন বাদ্যযন্ত্রসমূহ বিশ্রামলাভ করিল, তখন চিতাগর্ভে ভস্মরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। দর্শকেরা আপন-আপন বসনাগ্রে সেই ভস্ম সংগ্রহ করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

ভুবনমোহন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, সহমরণ প্রথা বড়ই ভয়ঙ্কর, কিন্তু রোসেনারার মত কুল-কলঙ্কিনী হইয়া থাকা অপেক্ষা সরোজার ন্যায় স্বামীশয্যায় সহমরণে জীবনোৎসর্গ করা লক্ষগুণে শ্রেয়স্কর

(৬)

জমিদারবাড়ীর অন্দর-পুষ্করিণীর সোপানোপরি বসিয়া ভুবনমোহন প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন।

ভুবনমোহন চিন্তায় বিভোর হইয়া মনে মনে ভাবিতেছেন— "সে আমার কোথায় গেল? যে দুদণ্ডের জন্য আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না, না দেখিলে তাহার সুটানা, সুন্দর নয়ন-যুগল যে অশ্রুপ্লাবিত হইত, আজ প্রায় ছয়মাস অতীত হইল আমাকে এই যাতনা রাশির মধ্যে ফেলিয়া সে কোথা গিয়া শান্তি পাইয়াছে রে! আজ কত-কত দিনের পর শত মূর্ত্তিময়ী বিশ্বাসঘাতিনী স্মৃতির নীরব মোহমন্ত্রময় বাঁশী শুনিতে শুনিতে কোথাকার পথ ভুলিয়া আবার সেই দুদণ্ডস্থায়ী অতীত সুখের অবসান—পুকুর-তটে আসিয়াছি! দিবসের কর্ম্মশ্রমে শ্রান্ত, বিবসনা-সন্ধ্যার এই শান্তিপ্রদ স্তব্ধতার শিথিলক্রোড়ে বসিয়া এই পুকুর আজ কি ভাবিতেছে—সে আমার নাই, আমার জন্য—এই হতভাগাকে ভালবাসিবার জন্য সে পরিমল-প্রাণা বেলা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কে—সে? যে, অতীত সুখের চিহ্ন স্বরূপ কত স্মৃতি জাগান এই পুকুর তটে আসিয়া আমার প্রাণে কত সুখ দুঃখ, ক্ষুদ্রজীবনটাকে কত বিরহ, মিলনের অভিনয় দেখাইয়া আমাকে চিরদিনের মত মুগ্ধ করিয়া তাহার অভিনয় শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে? কে—সে? কোথায়—সে? সে আমার কোন্ পথ দিয়া কোথা গেল গো! সে পথ কি তোমরা কেহ চেন? আমায় বলিয়া দাও না, কোথা দিয়া

কেমনে সেখানে যাইতে হয়? আমি সেখানে যাইতে পারিব না, তাই কি পুকুর আমাকে দেখিয়া লহরী তুলিয়া অত কঠিন বাক্যে সমীরণের "হায়-হায়" শব্দে কাঁদিয়া উঠিল! হৃদয় ফাটাইয়া যেন বলিয়া উঠিল, "সব অবসান! ব্রজের খেলা সাঙ্গ! আর তোমার অত মমতাপূর্ণ আত্মবিস্মরণকারী মধুমাখা দৃষ্টি কেন? কেন চক্ষু অশ্রুপূর্ণ? জান নাকি নিষ্ঠুর! আপন কার্য্যে ব্যস্ত, অন্ধ জড় প্রকৃতিরই এই নিয়ম? তোমার হৃদয় চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়া —তাহার কার্য্য শেষ করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। হায়! কে বলিয়া দিবে, আমাকে ফেলিয়া সে কোথায়—কোন্ দেশে—কোন্ সমুদ্রের তীরে চলিয়া গিয়াছে।

ভুবন বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া চিন্তা করিতেছেন। এদিকে প্রকৃতির পট পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সন্ধ্যা হইল, আকাশে চাঁদ উঠিল—প্রকৃতি সতী চাঁদের কিরণে উজ্জ্বল হইয়া হাসিতে লাগিলেন।

এই সময় ভুবনের গুরুদেব সন্ন্যাসী সত্যানন্দ ঠাকুর ভুবনের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মধুর স্বরে কহিলেন, "বৎস, সামান্য প্রেমের জন্য আত্মক্রিয়া বিস্মৃত হইলে?"

ভুবন পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, রবিকরক্লিষ্ট বৈকালের বিশুষ্ককুসুমে যেন শিশির কণা নিপতিত হইল। ভুবন সকল যন্ত্রণা হইতে যেন নিষ্কৃতি পাইয়া প্রণিপাত করত ভক্তিগদ্গদ-কণ্ঠে কহিল, "দেব! এ পাপ হৃদয়ে কখনও কি শান্তিবারি পড়িবে না? দয়াময়! হৃদয় যে অশান্তির সুদারুণ বহ্নিতে জ্বলিয়া গেল।

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তুমি অসীম-প্রেমের জন্য

কাতর হইয়াছ, তাই ওরূপ অশান্তি ভোগ করিতেছ। বস্তুতঃ প্রেম অতি পবিত্র পদার্থ। প্রেমেই জগতের উন্নতি। প্রেমই শক্তিসাধকদিগের একমাত্র অবলম্বন। প্রেম আকর্ষণীশক্তি—সংযত শক্তির উন্মেষ। শক্তির গুণবর্দ্ধন—প্রেমও আকর্ষণ করে বিকীর্ণ হয়। প্রেমের ধর্ম্ম প্রতিপদে অগ্রসর হওয়া, পিছাইয়া পড়া নহে। প্রেমে জগৎ ফুটিয়াছে, দানে জগৎ বাড়িয়াছে। এ জগতের তহবিলে যত জমা তত খরচ। সেখানে কৃপণতা সঙ্কীর্ণতা নাই। তাই বলি, যদি সম্পূর্ণ উন্নতি করিতে চাও, যদি সম্পূর্ণ উন্নতি কামনা কর, তবে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জগতের পদে বিসর্জ্জন কর। অনন্ত হও। যত দিবে, তত বাড়িবে। দেখ, ফিরিয়া কিছু আসে না, আবার দিলেও কিছুই কমে না। প্রেমের ধর্ম্মই এইরূপ।"

ভুবন কহিলেন, "আমি এ সসীম প্রেমভাব হৃদয় হইতে বিদূরিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাই, কিন্তু সক্ষম হই না। যেন সেই মুখখানি আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করে, আর একবার যেন সেই সুধামাখা কথায় কর্ণকুহর পবিত্র করিতে বাঞ্ছা হয়!"

সন্ন্যাসী। প্রেমে মজিয়া সতীশের কি হ'ল দেখ্‌লে?

ভুবন। ছিঃ! তাহাতে আর ইহাতে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ।

সন্ন্যাসী। অধিক না। ব্যক্তিগত যে প্রেম, তাহা আদৌ সুখের নহে। একের মন যখন অপরে বুঝে না, তখন কি স্থায়িত্ব ভালবাসা জগতে আছে ভুবন? তুমি যাহাকে ভালবাস, তাহার প্রাণের অভ্যন্তরে কি আছে জান না। সে হয়ত তোমাকে প্রাণঢালা ভালবাসা দেয়, কিন্তু সে অন্য কোন অভিপ্রায়ে অন্য পুরুষের দিকে চাহিল—আর তোমার প্রাণের ভিতর বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

কিম্বা তোমায় ভালবাসে কিন্তু হঠাৎ অন্য পুরুষের প্রণয়ে পড়িয়া গেল, তুমি তাহা জানিলে না, শুনিলে না, তোমার সে সাধের নন্দনকাননে অসুরের দৌরাত্ম্য হইল। আজ যে তোমাকে ভালবাসে, তুমি যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাস, কা'ল হয়ত তোমাকে দেখিয়া সে কেমন করিয়া কোন্ পথ দিয়া কোথায় লুকাইবে তাহা খুঁজিয়া পাইবে না। ভুবন! এ জগতে মিলন-গীতি অপেক্ষা বিরহ-গীতি কত অধিক বল দেখি? সহস্র সহস্র প্রেমিকের কণ্ঠ ভেদ করিয়া হতাশের উচ্ছ্বাস উঠিতেছে, "সেই তুমি, সেই আমি, এখন কোথা তোমার ভালবাসা।"

ভুবন। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা প্রামাণ্যই বটে। কিন্তু মহাশ্বেতার প্রণয়—শুধুই কি কবি-কল্পনা?

সন্ন্যাসী। না হউক, কিন্তু মহাশ্বেতার প্রণয় হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়া হৃদয়েই ছিল—সুতরাং তাহা সমভাবেই বসিয়াছিল। রূপোন্মত্ত যুবক যুবতীর প্রণয় রূপোন্মত্তার বিধ্বংসেই হৃদয় হইতে দূর হইয়া যায়। বল দেখি, এ জগতে কয়জন শুধু একের ভালবাসার জন্য আপন প্রাণ দিয়াছে? সে দিতে পারে—যে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনাকে এবং সমস্ত প্রাণীকে ও সমস্ত জগৎকে সেই পরম প্রেমভাজন সচ্চিদানন্দ-বিকাশ ভাবিয়া সমস্ত মনুষ্যকে, সমস্ত প্রাণীকে, সমস্ত বিশ্বকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিয়াছে। যদি সম্পূর্ণ ভালবাসার ডোর বাড়াইতে চাও, তবে সেই অনন্ত প্রেমের সাধনা কর, সেই সাধনার অন্যতম নামই শক্তিসাধনা।

ভুবন। শক্তি কি এবং শক্তিসাধনা কিরূপে করিতে হয়, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন।

সন্ন্যাসী। শক্তি কাহাকে বলে বলিতেছি। তুমি এই তৃণ গাছটি তোল দেখি।

ভুবন একগাছা তৃণ তুলিল। সন্ন্যাসী একটা বড় গাছ দেখাইয়া বলিলেন, "এইটা তোল।"

ভুবন বলিল, "অতবড় গাছ তুলিবার শক্তি কি আমার আছে?"

সন্ন্যাসী। তোমার তৃণ তুলিবার শক্তি আছে, বড় গাছ তুলিবার শক্তি নাই—শক্তি কি বুঝিয়াছ?

ভুবন। যদ্দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহাকেই কি শক্তি বলে?

সন্ন্যাসী। হাঁ, মোটামুটি তাহাই। এ জগতের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণু হইতে আর বিশাল মহীধর পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট হইতে আর মহাকায় হস্তী পর্য্যন্ত সকলেতেই অল্প হউক, অধিক হউক শক্তি বিরাজিত আছে। সেই সকল শক্তির সমষ্টিশক্তি অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্যক্তি যে শক্তি সাহায্যে মোক্ষপদপ্রাপ্ত হন, তাহাই ঐশ্বরিক শক্তি। ইহাই জগতের সমষ্টি শক্তি এবং জগদাধার প্রযুক্ত সেই সমষ্টি শক্তিই ঈশ্বর। মানুষের মানষিক ব্যাভার-সম্ভূত কর্ম্মসকল যেরূপ শক্তির অধীনে—পরে ফলপ্রদ হয়, সেই সূক্ষ্মজাতীয় শক্তিই দৈবশক্তি।

যোগযুক্তাত্মা পুরুষ সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখেন। যিনি আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ এবং আপনাতেই সর্ব্বভূতকে দেখিতে পান, তাঁহারই যথার্থ শক্তি-তত্ত্ব জ্ঞান জন্মিয়াছে। এরূপ জনের কাছে বর্ণ বিচার নাই, এরূপ জনের কাছে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, ধাতু মৃত্তিকা, দেব, গন্ধর্ব্বাদি, সম্বন্ধে প্রভেদ জ্ঞান নাই। ইনি পরের আপন, দূরের নিকট।

আমাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, এই বিশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সহিত তাঁহারও সেই সম্বন্ধ। আমাদের স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগ্নীর মুখ প্রফুল্ল ও মলিন দেখিলে যেমন প্রফুল্ল ও মলিন হয়, তদ্রূপ এই বিশ্বের প্রত্যেক নর-নারী, জীব-জন্তু, জড়-অজড়ের প্রফুল্লতা দেখিলে তাঁহার হৃদয় প্রফুল্ল, মলিনতা দেখিলে মলিন হয়। এরূপ সাধক নিতাই যথার্থ অদ্বৈতবাদী। 'একমেবা দ্বিতীয়াং' কথার অর্থ ইনিই বুঝিয়াছেন—ইনিই যথার্থ শক্তি সাধক। অতএব বৎস, শক্তি সাধনা কর, শক্তি পদতলে জীবন বলিদান দাও। এমন পথ—এমন আনন্দ—এমন উৎসাহ আর নাই।

এই সময় চন্দ্রকর-স্নাত নৈশ-বাত্যা আন্দোলিত হইয়া অদূর হইতে বামকণ্ঠবিনিঃসৃত গীত বহিতে লাগিল—

পার যদি জীবন মায়েরে সঁপিতে,
তবে জগতজন বাঁধা রবে প্রেমেতে।
নর, নারী, বৃক্ষ, লতা মলয়-নিকর,
ফুলের সুবাস, মধুকরের গুঞ্জর,
সকলি তোমার—রবে পূর্ণ সুখেতে।
জড়, অজড় যত নেহারিছ নয়নে—
আমরা সবাই এক মায়ের সন্তান,
ভিন্ন ভাব দূর করি চেষ্টা কর মিশিতে।
সসীম-শৃঙ্খলে কেন আবদ্ধ রহিয়ে
হায়, ভ্রম অবিরত মোহময় স্থানে,
ছিন্ন করি সে শৃঙ্খল, বিচর স্বর্গেতে।

সে গান অনেকক্ষণ গীত হইল। ভুবনের হৃদয়ের প্রত্যেক

তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে তাহা জলদ্‌গম্ভীর স্বরে প্রতিধ্বনিত হইল। ভুবন চাহিয়া দেখিল, পুকুরের অপর পারে একটা কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী যুবতী গান গাহিতেছে। ভুবন তাহাকে নিকটে ডাকিল। সে এলোচুল, উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে গান গাহিতে-গাহিতে ভুবনের নিকট আসিল। ভুবন তাহাকে চিনিল, তখন ভুবনের দেহ কণ্টকিত হইল—সে বনদেবী! সন্ন্যাসী ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "ভুবন, বনদেবীকে পেলে? বনদেবীর অসুস্থ শরীর সুস্থ করিবার জন্য এবং অসম্পূর্ণ শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমার আজ্ঞায় ভৈরবাচার্য্য উহাকে গাছতলা হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছিল।"

ভুবন সভয়ে সাশ্চর্য্যে কহিল, "ভৈরবাচার্য্যের মৃতদেহ যে গাছতলে দেখিয়াছিলাম!"

সন্ন্যাসী। যোগবলশালী ব্যক্তির পক্ষে দু'দশ ঘণ্টার জন্য মৃতবৎ হইয়া নিশ্বাস বন্ধ করা কঠিন ক্রিয়া নহে।

সেখানে তখন অল্পে অল্পে অনেক ভৈরব ভৈরবী আসিয়া জুটিল। ভৈরবাচার্য্যও উপস্থিত হইলেন।

(৭)

ভুবন জিজ্ঞাসা করিলেন, শক্তিসাধনা যাহারা করে, তাহাদিগকে কি শাক্ত কহে?

সন্ন্যাসী। তাহা জিজ্ঞাসা কর কেন?

ভুবন। শাক্ত, সৌর, গণপত্য, শৈব আর বৈষ্ণব এই পঞ্চ উপাসকের কথা শাস্ত্রে আছে। তবে শক্তি-সাধকেরা সবত্র শাক্ত।

সন্ন্যাসী। ঐ পঞ্চ উপাসকের সমষ্টির পূর্ণাবস্থায় যাহা হয়; এ শক্তিসাধক তাহাই অর্থাৎ ব্রহ্ম। এ কথাটা ভাল করিয়া জানিতে হইলে তোমাকে তিনখানি গ্রন্থ উত্তম করিয়া আয়ত্ত বুঝিতে হইবে। ঐ তিনখানির নাম "বেদান্তসার" 'ভগবদ্গীতা' ও 'মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র।"

একণে আমি তোমাকে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তরূপে কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর।

এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যিনি যাহার উপাসনাই করুন, সকলেই শক্তি উপাসক। ঈশ্বরে সত্ব, রজঃ, ও তম এই তিনগুণ আছে। সত্বগুণে উৎপত্তি, রজগুণে পালন ও তমগুণে সংহার ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। হিন্দুগণ ঈশ্বরের ঐ ত্রিগুণ তত্ত্ব মানুষের হৃদয়ে উত্তমরূপে ধারণা করাইবার জন্য সত্বগুণে ব্রহ্মা, রজঃগুণে বিষ্ণু ও তমগুণে এই তিন রূপের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মা স্বজন, বিষ্ণু পালন ও রুদ্র সংহার করেন। ব্রহ্মা স্বজন করেন, ব্রহ্মার সেই স্বজন শক্তি স্বাহা, বিষ্ণু পালন করেন, বিষ্ণুর পালন-শক্তি লক্ষ্মী, রুদ্র সংহার করেন, রুদ্রের সংহার শক্তির নাম রুদ্রাণী। যাহারা কালী-দুর্গার উপাসনা করে, তাহারা রুদ্রের সংহার-শক্তির সাধনা করিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা শক্তি-সাধনা করিয়া থাকেন। সূর্য্য মহাশক্তিবান্ দেখিয়া সৌর তাহাকে উপাসনা করে, সুতরাং সেও শক্তি-সাধনা। গণপতি সিদ্ধি ও জ্ঞানশক্তি সমন্বিত সুতরাং গণপত্যও শক্তি-সাধক। বৈষ্ণবের বিষ্ণু

রজঃগুণে বিভূষিত ও পালন করেন এবং মোক্ষ শক্তি সমন্বিত সুতরাং বৈষ্ণবও শক্তি-সাধক।

কিন্তু ঐ সকল সাধকেরা যখন সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ যখন তাঁহার চৈতন্যজ্ঞান জন্মে, তখন তাঁহার নিকট আর সাম্প্রদায়িক ভাব থাকে না। তখন তিনি ধর্ম্মের খোশা-ভূষী পরিত্যাগ করিয়া সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের পবিত্র শস্যগ্রহণে সক্ষম হয়েন। তখন তিনি শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব এই সকল ধর্ম্মের সমষ্টির পূর্ণাবস্থা যে সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান, সর্ব্বত্র সমদর্শী এবং সদানন্দ, তাহাই হইয়া তিনি তখন শক্তি-সাধক।

ভুবন। ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। যাহারা বৈষ্ণব, তাহারাও শক্তি-সাধক? আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বৈষ্ণবেরা শক্তির প্রসাদ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করে না।

সন্ন্যাসী। তাহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কিছুই জানে না বা তাহারা বৈষ্ণবপদবাচ্যই নহে।*

তোমাকে শক্তি-সাধনা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ—যে ব্রহ্মা, সেই বিষ্ণু, সেই মহেশ্বর, সেই রাধা, সেই কালী, সেই দুর্গা। যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই পালন করেন, তিনিই ধ্বংস করেন, তিনিই আবার সৃষ্টি করেন, তিনিই দাহ করেন, তিনিই ঝড় বাতাস করেন, তিনিই আলো করেন, তিনিই অন্ধকার করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, দুর্গা, কালী, রমা, রাধা সকলেই এক, তবে যেমন আমাদিগকে বুঝিবার সৌকর্য্যার্থে এক জলকে

* মৎপ্রণীত "বৈষ্ণব জীবন" দেখ।

কোথাও ডোবা বলি, কোথাও সমুদ্র বলি, কোথাও বিল বলি, কোথাও নদী বলি, তেমনি উপাসনার জন্ত তাঁহাকে কখন ঈশ্বর, কখন পরমাত্মা, কখন ব্রহ্মা, কখন কালী, কখনি দুর্গা, কখন গণপতি, কখন সূর্য্য, কখন বিষ্ণু, কখন শিব ইত্যাদি নানা আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া থাকি।

ভুবন। তবে তাঁহার প্রকৃত নাম কি?

সন্ন্যাসী। তাঁহাকে দুইভাবে চিন্তা করা যাইতে পারে। যখন তাঁহাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নিগুণ এবং সমস্ত জগতের আধার বলিয়া চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম অথবা পরমাত্মা। আর যখন তাঁহাকে ব্যক্ত, উপাস্য—সেই জন্ত চিন্তনীয়, সগুণ এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা স্বরূপ চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম—দর্শনে ঈশ্বর, বেদে প্রজাপতি, পুরাণেতিহাসে বিষ্ণু, শিব! আর যখন এককালীন তাঁহার উভয়বিধ লক্ষণ চিন্তা করিতে পারি, অর্থাৎ যখন তিনি আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে উদিত হন, তখন তাঁহার নাম আদ্যাশক্তি ভগবতী!

ভুবন। কেন তখনই তাঁহার নাম আদ্যাশক্তি ভগবতী কেন?

সন্ন্যাসী। পুরাণ, ইতিহাস, বেদ, তন্ত্র, উপনিষদ্ প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রসমূহে তাঁহাকে ঐ উভয়বিধ লক্ষণযুক্ত ধেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, এজন্ত আমি সেই জগন্মাতার দাসানুদাস, সেই নামেই তাঁহাকে অভিহিত করি। একবার তোমরা বল, "আদ্যাশক্তি ভগবতী হ্রীং দুর্গায়ৈ স্বাহা।"

তখনি সকলেই সমস্বরে বলিল, "আদ্যাশক্তি ভগবতী হ্রীং দুর্গায়ৈ স্বাহা।"

শেষে সকলে মিলিত হইয়া জমিদার বাড়ী (এখন ভুবনের বাড়ী) গমন করিলেন।

সন্ন্যাসীরা সেখানে কয়দিন অতিবাহিত করিয়া ভুবনের সহিত বনদেবীর বিবাহ দিলেন। শেষে একদিন ভুবনকে বলিলেন, "ভুবন, তবে তুমি সুখে সংসার কর। আমরা চলিলাম।"

ভুবন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিল, "কোথায় ?"

সন্ন্যাসী। তপস্যায়।

ভুবন। আমাকে সঙ্গে লইবেন না ?

"তুমি কিছুদিন গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, পরে যেও।" বলিয়া তাঁহারা সকলে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বিরজাকেও তাঁহারা সঙ্গে লইয়া গেলেন।

উপসংহার

(৮)

ভুবনমোহন ও বনদেবী বিবাহসূত্রে গ্রথিত হইয়া পরমসুখে সংসার করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ধর্ম্মসূত্রে গাঁথা—ধর্ম্ম যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়, কে জানে কেন তাঁহাদের জীবনের শেষভাগ অতি সুখে অতিবাহিত হইবেই হইবে।

ভুবনমোহন পূর্ব্বেও যেমন দরিদ্র ছিলেন, এখনও সে ভাব তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইল না। তিনি প্রায় পদব্রজেই গমনাগমন করিতেন। সেইরূপ দুঃখীর দুঃখ মোচন, পীড়িতের শান্তিপ্রদান ও অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে অত্যাচারিতের রক্ষা বিধান করিতেন। বনদেবীও গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম দাসীদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন না। তিনিও সর্ব্বদাই কাজকর্ম্ম করিতেন। এমন কি অপরিচিত কেহ দেখিলে তাঁহাকে দাসী ভিন্ন বাড়ীর কর্ত্রী বলিয়া ভাবিতে পারিত না। ভুবনের অকৃত্রিম প্রজাবাৎসল্যতায় ও ধর্ম্মাচরণে দেশের লোক তাঁহার রাজ্যকে রামরাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিত। এইরূপে তাঁহারা দ্বাদশবর্ষ সংসার করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দম্পতিযুগল পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহাদের সন্তানাদি হইল না।

শরৎকাল। বর্ষার দৌরাত্ম্য দূরিভূত হইয়াছে। জগৎ যেন এক নূতন ভাবে বিভোর। বর্ষা-কর-ক্লিষ্টা কুসুম-বালাগণ যেন হাঁপ ছাড়িতে পারিয়াছে, এখন তাহাদের বড় আনন্দ। নদী সকল

স্বচ্ছ-সলিলা। একদিন অতি প্রত্যূষে দম্পতিযুগল স্নান করিয়া গৈরিক-মৃৎরঞ্জিত বসন পরিধান করতঃ নৌকারোহণ করিলেন। পরিবারগণ, আত্মীয়, কুটুম্ব ও প্রজাবর্গ আসিয়া নদী সৈকতে দাঁড়াইল। ভুবনমোহন তাহাদিগকে মধুর বিনয়বাক্যে কহিলেন, "আপনারা গৃহে গমন করুন, আমরা গুরুদেবের আশ্রমে গমন করিলাম। পারি ত আবার আসিব।"

দেখিতে দেখিতে তরণী দর্শকদিগের দর্শনপথ অতিক্রম করিল, তখন সকলে আঁখিজল মুছিতে মুছিতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

সমাপ্ত।